মূল্য : এক টাকা

সাধনা ও ব্রহ্মকৃপা

অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য

সাধনা ও ব্রহ্মকৃপা

অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে
দেবপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত

ভাদ্র, ১৩৮৩

মুদ্রক : সুধাবিন্দু সরকার
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রদ্ধেয় অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বিভিন্ন সময়ে যে বক্তৃতা বা ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনটি এখানে ছাপা হইল। ব্রহ্মসাধনা এবং ব্রাহ্মধর্মের কথা এই ভাষণগুলিতে খুব স্পষ্ট ভাবে থাকাতে জিজ্ঞাসু সাধনার্থীদিগের নিকট এগুলি আদরণীয় হইবে। ব্রাহ্মধর্মের বিশেষত্ব, ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ, ও ব্রাহ্মধর্ম সাধনার ধারা এই ভাষণগুলির সাহায্যে সাধনার্থী ব্যক্তিদিগের নিকট সহজে উপস্থিত করা যাইবে।

লেখকের কন্যা শ্রীমনোজোৎস্না চন্দ এই পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়াছেন।

—প্রকাশক

সাধনা ও ব্রহ্মকৃপা

অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূচনা

ধর্মজগতে এমন অনেক প্রশ্ন আছে, যাহার মীমাংসা প্রত্যেক সাধককে স্বয়ং করিতে হয়। পূর্বে পূর্বে অনেক সাধক সে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন সত্য; এবং তাঁহাদের মীমাংসা গ্রন্থাদিতেও লিখিত আছে সত্য, কিন্তু সে সকল মীমাংসা পাঠমাত্র নবাগত ব্যক্তির সংশয় যায় না। তাঁহাকে নূতন করিয়া ভাবিতে হয়, জীবনের অনেক অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয়, অনেক সংগ্রাম করিতে হয়, অনেক সাধনা করিতে হয়; তবে তিনি আপনার মীমাংসা আপনি প্রাপ্ত হন। যখন আপন আত্মায় মীমাংসা হয়, কেবল তখনই তিনি নিঃসংশয় হন। চিন্তা, সংগ্রাম ও সাধনার পথে না গিয়া, অন্যের মীমাংসা পাঠ বা শ্রবণ দ্বারা, এমনকি, তৎসঙ্গে নিজের যুক্তি বিচার যথাসাধ্য যোগ করিয়াও, আত্মিক রাজ্যের প্রশ্নসকলের মীমাংসা হয় না।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। (১) পরমেশ্বর সুখদুঃখ, সম্পদ-বিপদ, সকল অবস্থাতেই আমাদের মঙ্গল করেন কি না; (২) তাঁর সঙ্গে আমাদের কেবল সাধারণ সম্পর্ক, না প্রত্যেকের বিশেষ সম্বন্ধ আছে; (৩) আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহা পূর্ণ করেন কি না;—এ সকল প্রশ্ন পূর্ব পূর্ব যুগে

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী, ৯ই মাঘ, পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পঠিত প্রবন্ধ।

সহস্রবার আলোচিত হইয়াছে। আলোচনার ফলও বহু গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে। তথাপি, আজও আমরা ধর্মরাজ্যে প্রথম পদক্ষেপ করিয়া এ সকল প্রশ্নই করিয়া থাকি। আচার্যেরা যদি গ্রন্থের মীমাংসা দেখাইয়া দেন, অথবা নিজের মীমাংসা বলিয়া দেন, তাহাতে আমাদের তৃপ্তি হয় না। পূর্বগত সাধকদের যুক্তি ও মীমাংসা আমাদের চিন্তার সহায়তা করে বটে; কিন্তু যতদিন আমরা নিজের চিন্তা, সংগ্রাম ও সাধনার দ্বারা স্বয়ং মীমাংসায় না পৌঁছি, ততদিন সংশয় দূর হয় না। যখন নিজের মীমাংসা হইয়া যায়, তখন আর অসংখ্য বিরুদ্ধ যুক্তিও আমাদিগকে টলাইতে পারে না।

ধর্মলাভ সম্পর্কে মানুষের সাধনাই বা কতটা প্রয়োজন এবং পরমেশ্বরের কৃপারই বা স্থান কি?—এই প্রশ্নটিও ঐরূপ। এই প্রশ্নও চিরকাল সাধকদের মনে আসিয়াছে; এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে আপন আপন মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মীমাংসায় আমাদের মীমাংসা হইয়া যায় নাই। আমাদের নিকট এই প্রশ্ন নূতন করিয়া আসিয়া থাকে; এবং আমাদিগকে স্বয়ং নূতন করিয়া ইহার মীমাংসা করিতে হয়।

সাধনা ও ব্রহ্মকৃপার সম্বন্ধ বিষয়ে এইরূপে যাহা বুঝিয়াছি, আজ তাহারই কয়েকটি কথা বলিতে অগ্রসর হইয়াছি। আমার কথাগুলির দ্বারা আপনাদের কাহারও মনে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না জানি; তবে চিন্তার সাহায্য কিয়ৎ পরিমাণে হইতে পারে।

সাধনা ও ব্রহ্মকৃপার সামঞ্জস্য সম্ভব

কোনো আলোচনা সভায় সাধনা ও ব্রহ্মকৃপার কথা উঠিলেই দেখা যায়, আমরা মুহূর্তমধ্যে দুই দলে বিভক্ত হইয়া যাই;—কয়েকজন সাধনার পক্ষ এবং কয়েকজন কৃপার পক্ষ অবলম্বন করি, এবং পরস্পরের মতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা পাই। এইরূপে দুই বিরুদ্ধ পক্ষ দাঁড়াইবার একটি গূঢ় কারণ আছে; তাহা এই যে, এক পক্ষ মনে করি, কৃপাবাদ স্বীকার করিলে আমাদের স্বভাবতঃ-অলস মন সাধনে আরও অধিক অলস হইয়া পড়িবে; এবং অপরপক্ষ মনে করি, সাধনবাদী হইলে আমাদের স্বভাবতঃ ঈশ্বর-নিরপেক্ষ অহঙ্কারী মন আরও অধিক অহঙ্কৃত হইবে। উভয়পক্ষের আশঙ্কাই যুক্তিযুক্ত। আমাদের মন বাস্তবিকই ধর্মসাধনে অলস এবং বাস্তবিকই আমরা ঈশ্বর-নিরপেক্ষ ও অহঙ্কারী। অতএব যাঁহারা আমাদিগকে সাধনায় উৎসাহিত করেন, তাঁহারাও আমাদের উপকারী বন্ধু; আবার, যাঁহারা আমাদিগকে পরমেশ্বরের মুখাপেক্ষী করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাও আমাদের পরম সুহৃৎ।

কিন্তু মানবাত্মার কি এমন একটা অবস্থা হইবে না, যখন তাহার আলস্যও থাকিবে না, অহঙ্কারও থাকিবে না? যখন আমরা নিরলস হইয়া সাধন করিব, অথচ অন্তর দীনতায় ও ঈশ্বরনির্ভরে পূর্ণ থাকিবে? অবশ্যই হইবে। আত্মা আপনার বিশুদ্ধ অবস্থায় নিরলস ও নিরহঙ্কার। যখন এমন অবস্থা আছে, তখন সাধনা ও ব্রহ্মকৃপা যুগপৎ স্বীকারের সম্ভাবনাও আছে।

আমরা ব্রাহ্মগণ স্বীকার করিয়া থাকি, সংসার ও ধর্মে সামঞ্জস্য হয়। যে সংসারযাত্রা ধর্মকে বাদ দেয়, আমরা তাহা চাই না। আবার যে ধর্মসাধন সংসারযাত্রাকে বাদ দেয়, আমরা তেমন ধর্মসাধনও চাই না। কিন্তু সংসারযাত্রা যখন শ্রমমূলক এবং ধর্ম যখন ঈশ্বরের অনুগত্য ও তাঁর প্রতি নির্ভর-মূলক, তখন দুইয়ের সামঞ্জস্য হইতে পারে স্বীকার করিলে, প্রকারান্তরে ইহাও স্বীকার করা হয় যে, শ্রম ও ঈশ্বরনির্ভরে সামঞ্জস্য হয়। তাই যদি হয়, তবে সাধনা ও কৃপাস্বীকারে কেন সামঞ্জস্য হইবে না? সংসার ও ধর্মের সামঞ্জস্য ত এ নয় যে, আমরা অর্দ্ধেক সময় সংসার করিব ও অর্দ্ধেক সময় ধর্ম করিব। প্রকৃত সামঞ্জস্যে দুইটি পৃথক থাকিবে না; মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। আমরা ঈশ্বরানুগত্যে থাকিয়া ও তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হইয়া, তাঁর প্রেরণায় সংসার করিব। সাধনা ও কৃপার সামঞ্জস্যও এইরূপ। ধর্মসাধনায় পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়াও কেমন করিয়া পরমেশ্বরে পূর্ণ নির্ভর হইতে পারে, এ সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে যাইতেছি।

সংসার রাজ্যে পরিশ্রম

প্রথমতঃ, সংসাররাজ্যে ও ধর্মরাজ্যে, উভয়ক্ষেত্রেই যে পরমেশ্বর পরিশ্রমকে কিরূপ অপরিহার্য করিয়া রাখিয়াছেন, এ বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলি।

এ সংসারে অন্নবস্ত্র সংগ্রহের ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য আমাদিগকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়। কৃষক দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, রৌদ্রবৃষ্টি জলকাদা অগ্রাহ্য করিয়া কঠিন শ্রম দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে। শিল্পী বাহিরের সকল প্রকার আমোদ-আহ্লাদ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করে। শাঁখারী পল্লীতে পদার্পণ করিলে দেখা যায়, বালক-বৃদ্ধ-যুবা প্রগাঢ় ঐকান্তিকতার সহিত অবিরাম শ্রম করিতেছে। কাঁসারীপাড়ায় প্রাতে ছয়টা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ঠং ঠং ধ্বনির বিরাম হয় না। অফিসে কর্মচারিগণ সংসারের অপর সকল কথা ভুলিয়া প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা, আট ঘণ্টা বা ততোধিক কাল আপন আপন কার্যে নিযুক্ত থাকেন। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা বিদ্যালাভের কার্য দশ বৎসর বা পনের বৎসর ধরিয়া আপনাদের লঘু প্রবৃত্তি-সকলকে সংযত করিয়া, প্রত্যহ বিদ্যালয়ে পাঁচ ঘণ্টা ও গৃহে ৫।৬ ঘণ্টা অধ্যয়নে রত থাকেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের ইহার সঙ্গে আবার কত শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদিগকে নিয়মিত পুস্তক অধ্যয়ন ব্যতীত, রাত্রি জাগরণ করিয়া হাসপাতালে কত ডিউটি খাটিতে হয়, ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া কত গলিত শবদেহ ছেদন করিতে হয় এবং মৃত্যুভয় অগ্রাহ্য করিয়া কত সংক্রামক রোগীর শুশ্রূষা করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াও জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা জ্ঞানরাজ্যের নব নব তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য সংসারে নানা আহ্বানের প্রতি বধির হইয়া আজীবন পরিশ্রম করিতে থাকেন। অতএব, কি জ্ঞানোপার্জন কি জীবিকা অর্জন, সকল ক্ষেত্রেই মানুষের কঠিন সাধনা ও তপস্যার প্রয়োজন হয়।

ধর্মরাজ্যে পরিশ্রম

চরিত্রগঠন ও ধর্মলাভের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম। জীবনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠকার্য যে আত্মার উন্নতি সাধন, তাহাও পরমেশ্বর পূর্বোক্ত বিষয়গুলির ন্যায় কঠিন শ্রমসাধ্য করিয়া রাখিয়াছেন। অমূল্য ধর্মধন জীবনব্যাপী তপস্যা ভিন্ন আত্মাতে ও চরিত্রে অধিগত হয় না।

দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। পরমেশ্বরের অস্তিত্বের ক্ষীণ আভাস মানুষের চিত্তে সহজেই আসে। বাল্যাবস্থায় চিন্তাশক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সকল মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বের আভাস পায়। কিন্তু সেই অস্পষ্ট ক্ষীণ আভাসকে সন্দেহের আক্রমণ হইতে মুক্ত করিয়া উজ্জ্বল জ্ঞানমূলক বিশ্বাসে পরিণত করিতে মানুষকে কত দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যয়ন, চিন্তা ও ধ্যান করিতে হয়! পরমেশ্বরের যে ধারণা তরুণ হৃদয়ে প্রথমে জাগ্রত হয়, তাহা স্বভাবতঃ নিতান্ত স্থূল থাকে। আমরা প্রথমতঃ তাঁহাকে মানুষেরই মত শরীরধারী, স্থানবিশেষে অবস্থিত, ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন, রাগদ্বেষপূর্ণ মনে করি। শক্তিমান রাজা বা জমিদারের মধ্যে আমরা যে প্রভুত্বপ্রিয়তা, যথেচ্ছাচার, স্তুতিপ্রিয়তা, পক্ষপাত প্রভৃতি দেখিতে পাই, পরমেশ্বরকেও প্রথমে সেইরূপ স্বভাবযুক্তই মনে করি। এবংবিধ স্থূল ও মিথ্যা ধারণা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় পাইতে কত চিন্তা, কত অধ্যয়ন ও কত ধ্যানধারণার প্রয়োজন হয়!

পরমেশ্বরকে মানবীয় ত্রুটী দুর্বলতা হইতে মুক্ত, অথচ মানবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে; তাঁহাকে জগতের অতীত, অথচ জগতে অনুস্যূত বলিয়া বুঝিতে হইবে; তিনি যে নির্লিপ্ত অথচ ক্রিয়াশীল, শক্তিমান অথচ সংযত, ন্যায়বান অথচ করুণাময়, সাধারণের অথচ প্রত্যেকের, এ সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং তাঁহার নিয়মসকলকে অমোঘ, সমদর্শী, দোষশূন্য এবং মানবাত্মার সর্বাঙ্গীন কল্যাণের সহায় বলিয়া জানিতে হইবে। এ সকল জানিতে বুঝিতে ও উপলব্ধি করিতে কতকালের শ্রম ও সাধনার প্রয়োজন!

তৎপরে, এই জগৎ-রূপ ও মানবাত্মা-রূপ যে দুই মহাগ্রন্থ পরমেশ্বর মানুষের সাক্ষাতে খুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে হইবে; এবং এই দুই মহাগ্রন্থের ভাষ্যস্বরূপ নানাদেশের নানাযুগের জ্ঞানিগণ যত পদার্থবিজ্ঞান ও আত্মবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, যথাসাধ্য সে সকলের আলোচনা দ্বারা নিজ জ্ঞানের বিকাশ সাধন করিতে হইবে। তবে ত ভূমা পরমেশ্বরের অনন্ত মহিমার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া সম্ভব হইবে। ইহাতেও কত শ্রম ও অধ্যবসায় আবশ্যক!

অপরদিকে, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর হৃদয়কে উদার ও পরার্থপর করিতে হইবে; আপনার ও পরিজনগণের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের চিন্তায় যে মন সম্পূর্ণ নিযুক্ত, তাহাকে সমাজের, দেশের ও জগতের মঙ্গলচিন্তায় অভ্যস্ত করিতে হইবে। ইহাতে কত চেষ্টার প্রয়োজন! তারপর কেবল চিন্তায় ও ভাবে নহে, নিত্য

কার্যগত সেবা দ্বারা পরকে আপন করিতে হইবে; সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষী জীবনের পরিবর্তে উদার পরার্থপর জীবনলাভ করিতে হইবে। ইহাতে কত আত্মানুসন্ধান ও ত্যাগস্বীকারের আবশ্যক!

দিবারাত্রি অন্তরের অভিসন্ধিসকলকে পরীক্ষা করিয়া সে সকলকে সত্য, ন্যায়, প্রীতি ও পবিত্রতার নিয়মসমূহের অনুগত করিতে কত ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় দরকার!

জীবনগঠনমূলক সত্যধর্মের সাধনা কি, তার একটু আভাস দেওয়া হইল। প্রকৃত সাধনা কোনো গুপ্ত ক্রিয়াবিশেষ নহে, যদ্দারা পাখীকে জালে আবদ্ধ করার ন্যায়, পরমেশ্বরকে কৌশলে আয়ত্ত করিয়া ফেলা যাইবে। যে সাধনায় মানবাত্মার বিকাশের সহায়তা না হয়, তাহাকে ধর্মসাধন বলা সঙ্গত নয়। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের পথই ঈশ্বরলাভের পথ। মানুষ যে পরিমাণে জ্ঞানে, প্রীতিতে, পবিত্রতায়, সৎসাহসে, নরসেবায়, উদারতায় মহৎ হইবে, সেই পরিমাণে মহান পরমেশ্বরের যথার্থ পরিচয় পাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে।

বর্তমান যুগে ধর্মের আদর্শ বড়ই ব্যাপক ও বিশাল হইয়াছে। এ যুগের মহাধর্মের মহাসাধনা মানবজীবনের সকল বিভাগ-ব্যাপী। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম (সদনুষ্ঠান) কোনোটিকে অবহেলা করিবার জো নাই। শরীর, গৃহ-পরিবার, সমাজ, দেশ, সকলেরই প্রতি কর্তব্য অনাসক্ত ভাবে, মহৎ লক্ষ্যে, ভগবদ্দৃষ্টিতে সম্পন্ন করিতে হইবে! সুতরাং এই মহাধর্মের সাধনা জীবনব্যাপী যত্ন চেষ্টা ভিন্ন সম্পন্ন হওয়া কি নিতান্তই অসম্ভব নহে?

অতএব, ধর্মজীবনলাভে সাধনার আবশ্যকতা অস্বীকার করিলে সত্যের ঘোর অপলাপ হয়; এবং নিজের ও অপরের সমূহ অকল্যাণ করা হয়।

অন্যান্য সাধনার সহিত ধর্মসাধনার প্রভেদ

কিন্তু সাধনার আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করিয়াও বলিতে হয়—আত্মশক্তির উপরে নির্ভর অপর সকল ক্ষেত্রে যথেষ্ট হইলেও ধর্মের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। ধর্ম-সাধনায় ভগবৎকৃপার চিন্তা ও তদুপরি নির্ভর একান্ত প্রয়োজন; এ কথাটি একটু পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি।

জীবিকা অর্জন প্রভৃতির জন্য মানব-সাধারণের যে সাধনা, তার সহিত ধর্মার্থীর ধর্মসাধনার একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। সেটি লক্ষ্য না করাতেই আমরা ধর্মের ক্ষেত্রে সাধনা ও ভগবৎ কৃপার সামঞ্জস্য করিয়া উঠিতে পারি না। ধর্মের সাধনা পরমেশ্বরকে লইয়া—যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি সত্তাতে, শক্তিতে, জ্ঞানে, মঙ্গলভাবে, প্রেমে, পুণ্যে, সকল দিকেই অসীম, তাঁহাকে লইয়া। তাঁহাকে স্বীকার করা, গ্রহণ করা, বরণ করার অর্থই আপন অহঙ্কারকে বিলোপ করিয়া তাঁহার হওয়া; আপনার শক্তি ও কৃতিত্বকে না দেখিয়া তাঁহার শক্তি ও কৃতিত্বকে দেখা; জীবনের সকল বিভাগ হইতে 'আমি-আমি' ও 'আমার আমার' ভাব সরাইয়া, সেই স্থলে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করা; ধ্যানে জ্ঞানে তাঁহাকে রাখা; তাঁহার প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি হৃদয়ে পোষণ করা; এবং সর্বতোভাবে তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহার

প্রেরণায় সকল কার্য সম্পাদন করা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কৃপার জ্ঞানকে সরাইয়া আত্মশক্তিকে দেখিলে সাধনার উদ্দেশ্যই যে পণ্ড হইয়া যায়। আত্মশক্তিকে আর না দেখিতে পাওয়াই ত এ ক্ষেত্রে সিদ্ধির একটি প্রধান লক্ষণ।

শাঁখারী ও কাঁসারী, কৃষক বা ছাত্র, ভগবৎকৃপাকে স্মরণ না করিয়াও আপন আপন অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তুর প্রতি সেই অনুরাগ, তাঁহাদের সেই পরিশ্রমশক্তি, সেই আত্মসংযম ও অধ্যবসায়ই তাঁহাদিগকে সিদ্ধি দান করে। বহু স্থলে নাস্তিক হইয়াও পরিশ্রমী, সংযমী, উদ্যমশীল ও দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তিগণ নিজ নিজ লৌকিক অভীষ্ট লাভ করিতেছেন। কিন্তু যেখানে পরমেশ্বরকে লাভ করাই লক্ষ্য; যেখানে তাঁহার মহত্ত্ব ও কর্তৃত্ব চিন্তায় আপনাকে নিরভিমান করা, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করা এবং জীবনে তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ লীলা দেখিয়া ভক্তি-সলিলে হৃদয়কে অনুক্ষণ সিক্ত রাখাই উদ্দেশ্য, সেখানে তাঁহার কৃপার চিন্তাকে বাদ দিলে চলিবে কিরূপে? কৃপার চিন্তা, কৃপার কথা বাদ দিলে, যাঁহাকে চাহিতেছি তাঁহারই এক প্রধান স্বরূপকে বাদ দেওয়া হয়। যদি বলি সাধনার গুণেই কালের নিয়মে সিদ্ধিলাভ করিব, তবে সাধনা ও সিদ্ধি উভয়ের সম্বন্ধেই ধারণার অস্পষ্টতা প্রকাশ পাইবে।

যে মহান্ পরমেশ্বর আপনার মহিমা ও গৌরবের প্রকাশ দ্বারা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে স্তম্ভিত ও সম্ভ্রমে অবনত করেন, যিনি আপনার গুণরাশির সৌন্দর্য ও অহেতুকী করুণার প্রকাশ

দ্বারা মানুষের হৃদয়কে পরাজিত, মুগ্ধ ও অভিভূত করেন, যিনি আপন সর্বময় কর্তৃত্ব ও পরম মঙ্গলজনক আধিপত্যের প্রকাশ দ্বারা মানবাত্মাকে নিরভিমান করিয়া আপন চরণে লুণ্ঠিত করেন. তাঁহাকে কলের নিয়মে কোনো প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা পাওয়া কি সম্ভব হইতে পারে? তাঁহাকে পাওয়ার অর্থই স্তম্ভিত হইয়া পাওয়া, মুগ্ধ হইয়া পাওয়া, লুণ্ঠিত হইয়া পাওয়া। তাঁহাকে মহৎ-রূপে, পরমাশ্রয়-রূপে, প্রতিপালক-রূপে, পরিত্রাতা-রূপে, একমাত্র গতি ও ভরসা রূপে, 'তুমিই সব' এইরূপে না পাইলে, পাওয়া হইয়াছে মনে করা উচিত নয়।

নিয়মপালনে সিদ্ধিলাভ

এ কথা সত্য যে, এই জগতে যেমন অন্যান্য বস্তুর লাভের নিয়ম আছে, তেমনি পরমেশ্বরকে লাভ করিবারও নিয়ম আছে; এবং এ কথাও সত্য যে মানুষের দিক হইতে সাধনাই সেই নিয়ম। কিন্তু এই যুক্তির বলে আমরা সাধনাকে বড় করিয়া কৃপার চিন্তাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। তাহার কারণ বলিতেছি।

অন্যান্য বস্তুর সাধনায় নিয়মই বড়; নিয়মানুযায়ী কার্য সম্পাদনই মুখ্য চিন্তার বিষয়; অভীষ্ট বস্তুটি নিয়ম পালনের ফল; সুতরাং তাহা নিয়ম অপেক্ষা ছোট। কিন্তু ধর্মসাধনায় নিয়মানুযায়ী কার্য সম্পাদন মুখ্য চিন্তার বিষয় নহে; অভীষ্ট বস্তু অর্থাৎ পরমেশ্বরই মুখ্য চিন্তার বিষয়। নিয়ম পালনের কথা ভুলিয়া এখানে অভীষ্ট বস্তুকেই প্রাণপণে চাহিতে হইবে,

ভাবিতে হইবে, চিনিতে হইবে। এখানে যিনি নিয়মসকলের প্রবর্তক, তিনিই লক্ষ্য। তিনি নিয়মসকলের প্রবর্তক বলিয়া তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিয়মসকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করা ও তাঁহার শরণ গ্রহণ করাই এ রাজ্যের নিয়ম।

অনুরাগ একটি নিয়ম

ঈশ্বর-সাধনের রাজ্যে অনুরাগ একটি প্রধান নিয়ম। যাহার অনুরাগ আছে, সে ঈশ্বরকে পায়; যাহার অনুরাগ নাই, সে তাঁহাকে পায় না। একটি ব্রহ্মসঙ্গীত আছে—"কেবল অনুরাগে তুমি কেনা। প্রভো, বিনা অনুরাগ, করে যজ্ঞযাগ, তোমারে কি যায় জানা?" এই নিয়মটি দেখাইয়া দিতেছে যে, নিয়মসকলকে নয়, ক্রিয়ানুষ্ঠানকেও নয়, যিনি লভনীয় তাঁহাকেই লক্ষ্যস্থলে রাখিতে হইবে, এবং সমগ্র হৃদয় দ্বারা তাঁহাকেই টানিতে হইবে। তাঁহাকে চাহিবার সময় যদি ভাবা যায় আমি নিয়মপালন করিতেছি, তবে জোরের সহিত চাওয়াই হয় না।

অনুরাগ যে ঈশ্বরলাভের নিয়ম বা সর্ত, তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, পরমেশ্বর প্রত্যেকটি মানবাত্মাকে বিশেষভাবে আপনার করিতে চান। মানুষ যদি হৃদয়-মন-প্রাণে তাঁহাকে না চায়, তবে তিনি তাহার সহিত গূঢ় প্রীতিযোগ স্থাপন করিবেন কিরূপে? অনুরাগে মানুষ তাঁহাকে না চাহিলে, তিনি আপনার প্রীতি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে পারেন না।

এইজন্যই অসীম প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর আত্মপ্রকাশে সর্বদা ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও মানুষের অনুরাগের অপেক্ষা থাকিয়া যায়। মানুষের অন্তরে পূর্ণ অনুরাগ উৎপন্ন না হইলে সে পরমেশ্বরের পূর্ণ প্রীতিও সম্ভোগ করিতে পারে না। কিন্তু অনুরাগে তাঁহাকে চাহিবার সময় নিয়ম পালনের কথা স্মরণ করা অসম্ভব।

দীনতা আরেকটি নিয়ম

ঈশ্বরলাভের পক্ষে দীনতা আর একটি প্রধান নিয়ম। মানুষের অপর সকল লভ্য বস্তু আপনা অপেক্ষা ছোট। সাম্রাজ্যলাভ, তাহাও আপনা অপেক্ষা ছোটো বস্তুর লাভ। কেবল পরমেশ্বরই (ও মান্য মনুষ্যগণ) আপনা অপেক্ষা বড়। সুতরাং অপর সকল বস্তু দীনতা ভিন্ন লাভ করা সম্ভব হইলেও, ঈশ্বরলাভ (ও মান্য মান্য মনুষ্যগণকে লাভ) দীনতা ভিন্ন হইতে পারে না। পূর্বে বলিয়াছি, ঈশ্বরকে পাওয়ার অর্থই মহৎরূপে পাওয়া, আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে পাওয়া। শুধু শ্রেষ্ঠরূপেই নহে; 'তিনিই সব, আমি স্বয়ং কিছুই নই,' 'তাঁহারই সব, আমার নিজের কিছুই নয়,' এইরূপে অহঙ্কারশূন্য ও মমকারশূন্য হইয়া তাঁহাকে না পাইলে যথার্থ পাওয়া হইল না। 'অহঙ্কার' শব্দের অর্থ অহং-অহং করা, 'মমকার' শব্দের অর্থ মম-মম করা। অহঙ্কার ও মমকার যে জীবনে রহিয়াছে, সে-জীবনে ঈশ্বর এখনও আসেন নাই; যে-জীবনে ঈশ্বর আবির্ভূত হইয়াছেন, সে জীবনে অহঙ্কার ও মমকার নাই। যেমন, অন্ধকার যেখানে

সেখানে আলোক নাই; আলোক যেখানে, সেখানে অন্ধকার নাই। অতএব, পূর্ণ দীনতা যে ঈশ্বরানুভূতির নিয়ম বা সর্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিন্দুমাত্র আত্মশক্তি বা কৃতিত্বের বোধ সহ যথার্থ ঈশ্বরানুভূতি হইতে পারে না। আমরা সাধনা করিব; কিন্তু আপন শক্তিতে বা আপন বুদ্ধিতে সাধনা করিতেছি, এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বে, অথবা আমার সাধনারই ফলে আমি তাঁহাকে লাভ করিব এই স্পর্দ্ধা থাকা সত্ত্বে তাঁহার উপলব্ধি সম্ভব হইবে না। কিঞ্চিৎ বিনয় নয়, ভাবুকতাও নয়; নিরবশেষে অহঙ্কারের বিলোপ হওয়া প্রয়োজন। আহা! সেই দীনতা কি গভীর দীনতা, যার কাছে পরমেশ্বরের পূর্ণ মহিমা প্রকাশিত হয়!

প্রার্থনা অপর নিয়ম

অনুরাগ ও দীনতা, এই দুইটি স্বর্গীয় বস্তুর মিলনে প্রার্থনার উৎপত্তি হয়। প্রার্থনা ঈশ্বরোপলব্ধির আর একটি প্রধান নিয়ম বা সর্ত। অনুরাগ যে কেন সর্ত, তাহা বলা হইয়াছে; অনুরূপ না হইলে প্রেমস্বরূপের সহিত প্রেমযোগ হইতে পারে না। দীনতা যে কেন সর্ত, তাহাও বলা হইল; দীনতা না আসিলে পূর্ণস্বরূপের পূর্ণ মহিমা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। এক্ষণে প্রার্থনার কথা বলিতেছি। প্রার্থনা আর কি? দীনভাবে তাঁহার প্রতি অনুরাগী হওয়া, দীনভাবে তাঁহাকে চাওয়া, তাঁহার স্বভাব চাওয়া, তাঁহার সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষা করা। সুতরাং প্রার্থনাও ঈশ্বরলাভের সর্ত। বলা বাহুল্য,

সাংসারিক সুখ-সম্পদের জন্য প্রার্থনা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে।

পরমেশ্বর না চাহিতে অনেক দিয়াছেন; পরেও যাহা প্রয়োজন তাহার অনেক না চাহিতেই দিবেন। না চাহিতে দেন বলিয়া প্রার্থনার প্রয়োজন নাই, তাহা নয়। বরং এ জন্যই তাঁহার প্রতি দীনতা ও অনুরাগ আরও অধিক হওয়া উচিত। সেই করুণাময়ের অসীম করুণার জন্য অসীম কৃতজ্ঞতা ও অসীম নম্রতাই ত স্বাভাবিক।

পরমেশ্বর আমাদিগকে না চাহিতে অনেক দিয়াছেন বটে; কিন্তু সব দেন নাই। গূঢ় আধ্যাত্মিক সম্পদসকল এখনও দেন নাই—দিব্য জ্ঞান, দিব্য প্রেম, দিব্য পুণ্য দেন নাই; আপনাকে দেন নাই। অথবা সত্য কথা এই যে, সবই দিয়া রাখিয়াছেন; উপযুক্ত চেতনার অভাবে আমরা পাই নাই; যেমন জড়পদার্থ ও পশুপক্ষী পায় না। ব্যাকুল প্রার্থনা আত্মার সেই চেতনার লক্ষণ, যে চেতনায় পরমেশ্বর আপনাকে প্রকাশ করেন; যাহাতে তিনি আপন স্বর্গীয় সম্পদরাশি ঢালিতে থাকেন।

অতএব প্রার্থনাও আত্মিক রাজ্যের নিয়ম। কিন্তু নিয়ম হইলেও, প্রার্থনাকালে আমরা নিয়ম পালন করিতেছি বলিয়া মনে করি না। 'নিয়ম পালন করিতেছি' মনে হইলে আর সে প্রার্থনা 'প্রার্থনা' নামের যোগ্য থাকে না।

তাই বলিতেছিলাম, নিয়মানুসারেই সিদ্ধি লাভ হয় বটে; কিন্তু এ রাজ্যে নিয়মকে ভুলিয়া প্রাণপণে অভীষ্ট বস্তুকে

আকাঙ্খা করিতে হয়। কি অনুরাগের নিয়মে, কি দীনতার নিয়মে, কি প্রার্থনার নিয়মে, নিয়ন্তাকে লইয়াই আমাদের সাধনা। তাঁহাকে বাদ দিয়া, কোনো গোপন প্রক্রিয়ার সাহায্যে যান্ত্রিক কৌশলে পরমেশ্বরকে লাভ করা সম্ভব নয়।

প্রার্থনা সংসারের ভিক্ষাবৃত্তির ন্যায় নহে

প্রার্থনা সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে। অনেকে প্রার্থনাকে সংসারের ভিক্ষাবৃত্তির সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ইহা দুর্বলতার লক্ষণ। তাঁহারা মনে করেন, যেমন সংসারে সকল জিনিসই লোকে আত্মশক্তি দ্বারা অর্জন করে, ধর্মও তদ্রূপ আত্মশক্তির দ্বারাই অর্জন করা উচিত। প্রার্থনারূপ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে চরিত্রের বল নষ্ট হয়; উহা হীন মনোবৃত্তি।

বাস্তবিক পরমেশ্বরের নিকট আত্মার সম্পদ প্রার্থনা কি সংসারের ভিক্ষাবৃত্তির সদৃশ? একটু বিবেচনা করা যাক। ভিক্ষাবৃত্তিকে আমরা হীন মনে করি কি কারণে? ইহাতে আত্ম-সম্মান নষ্ট হয়। দ্বিতীয়, যে বস্তু আপন শক্তির দ্বারা অর্জন করিলে শক্তির বিকাশ হইতে পারিত, তাহা অপরের দয়ায় লাভ করিলে সেই বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে। তৃতীয়, অন্যের কষ্টোপার্জিত বস্তু চাহিয়া লইয়া ভোগ করা ন্যায়সঙ্গত নহে। পরমেশ্বরের নিকট আত্মিক সম্পদ চাহিলে কি বাস্তবিক এই তিন দোষ ঘটে?

প্রথমতঃ, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে কি মানুষের

আত্মসম্মানের হানি হয়? আত্মসম্মান কাহাকে বলে? নত হওয়া মাত্রই কি আত্মসম্মানের বিরোধী? নত হওয়ার দুইটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় একদা আশীর্বাদপ্রার্থী হইয়া বাড়ীর মেথরাণীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন—'মাগো! আমাকে তুমি আশীর্বাদ কর; আমার যেন ভক্তি লাভ হয়; আমি যেন ভগবানকে পাই।' সাধু প্যারীলাল ঘোষ, (যিনি বিন্ধ্যাচলে ও নর্মদাতীরে কঠোর তপস্যা করিয়া 'মৌনীবাবা' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন), শুনিয়াছি তিনিও গৃহত্যাগের প্রাক্‌কালে বড়-ছোট সকলের নিকট এইরূপে প্রণত হইয়াছিলেন। মেথরাণীও বাদ পড়ে নাই। আমরা যখন এই সকল বিবরণ পড়ি বা শুনি, তখন কি আমাদের মনে হয়, ইঁহারা আত্মসম্মান হারাইয়াছিলেন? না, হৃদয়ে ইঁহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উদয় হয়? আমরা কি ভাবি না—'আহা! কি নিরহঙ্কার! কি ভক্তিপিপাসা! ঈশ্বর-লাভের জন্য কি ব্যাকুলতা! হায়, আমরাও যদি এ ভাব পাইতাম!'

নত হওয়ার আর একপ্রকার দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন। এও একটি সত্য ঘটনা। উচ্চপদস্থ দেশীয় রাজকর্মচারীদের অনেক সময় গভর্ণর-সাহেবের সহিত দেখা করিবার প্রয়োজন হয়। সময় সময় ব্যক্তিগত পরিচয় রক্ষার জন্যও তাঁহারা লাট-ভবনে যান। একবার শিলং সহরে এক বাঙ্গালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এইরূপে লাটভবনে গেলেন। লাট-পত্নীর সহিতও তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল। সাহেবের সহিত কথাবার্তা হইয়া

যাওয়ার পর তিনি যখন লাট-পত্নীর সহিত খোসগল্প করিতেছেন, তখন ঘটনাক্রমে আমাদের পরিচিত অপর এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীও তথায় গমন করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি বাহির হইতে দেখিলেন—সুপ্রশস্ত হল-ঘরে লাট-পত্নী গৌরবান্বিত আসনে উপবিষ্ট; আর ডেপুটি মহোদয় তাঁহার পাদমূলে জানুপরি উপবেশন করিয়া বাক্যালাপ করিতেছেন! আপন হ্যাটটি পার্শ্বে কার্পেটের উপর রাখিয়াছেন। ঘরে আর চেয়ার ছিল না, তা নয়; অনেক ছিল কিন্তু হয়ত তাঁহাকে চেয়ারে বসিতে বলা হয় নাই; অথবা তিনি স্বেচ্ছায় দীনভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ ঘটনা শুনিলে কি সকলেরই মন ঘৃণা ও লজ্জায় পূর্ণ হয় না?

দুই স্থানেই নত হওয়া; অথচ আমাদের মনোভাবের এই পার্থক্য হয় কেন? একস্থলে মেথরাণীর পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করাকে শ্রদ্ধা করি, অপর স্থলে লাট-পত্নীর সম্মুখে ঐরূপ নত হওয়াকে ঘৃণা করি; ইহার কারণ কি? কারণ বাহিরের কার্যে নয়; অভিসন্ধির মধ্যে। প্রথম স্থলে পবিত্র দীনভাব, ভক্তি-পিপাসা, ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা—অর্থাৎ আত্মার মহৎ-স্বরূপের অনুযায়ী ভাব। দ্বিতীয় স্থলে ক্ষুদ্র স্বার্থ আদায়ের আকাঙ্ক্ষা, মলিন সাংসারিক অভিসন্ধি, হীন চাটুকারিতা—আত্মার মহৎস্বরূপের বিরোধী ভাব। তবেই দেখা যাইতেছে, মানুষ যখন আত্মার মহৎস্বরূপের অনুযায়ী কার্য করে, তখন তাহার মহত্ত্ব বৃদ্ধি হয়; আর যখন তদ্বিপরীত কার্য করে, তখন সে হীন হইয়া যায়। 'আত্মসম্মান' শব্দের অর্থ আত্মার মহৎ-

স্বরূপের সম্মান। পরমেশ্বরের নিকট নত হইলে কি সেই স্বরূপের অবমাননা হয়? অবমাননা হওয়া দূরে থাক, তাঁর সান্নিধ্যেই আত্মার সকল গুণের স্ফূর্তি হয়।

পরমেশ্বরের স্বরূপই মানবাত্মার মৌলিক স্বরূপ; তাঁর স্বভাবই মানবাত্মার মৌলিক স্বভাব। প্রভেদ এই যে, তিনি মহান, মানবাত্মা ক্ষুদ্র; তিনি পূর্ণ, অভাবহীন, মানবাত্মা সর্বদাই অপূর্ণ ও অভাবগ্রস্ত। সুতরাং তাঁহার নিকট কাতর ভাবে উপস্থিত হওয়া, তাঁহার কৃপার প্রার্থী হওয়া, মানুষের পক্ষে আত্মমর্যাদার হানিকর নয়; বরং ইহাই তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ও মহত্ত্বলাভের উপায়।

পরমেশ্বরের নিকট নত হওয়ার অর্থ—স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করা, অসংযত প্রবৃত্তিসকলকে সংযম ও শাসনের অধীনে আনা, অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গল-পথের পথিক হওয়া। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করার অর্থ—আত্মার চরম নিয়তিকে প্রাণপণে টানা, ঈশ্বরানুগত পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শকে ব্যাকুলভাবে আকর্ষণ করা। সুতরাং তদ্দারা আত্মার হীনতা না ঘটিয়া মহত্ত্বই বর্দ্ধিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রার্থনা করিলে কি আমাদের শক্তির বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে? প্রার্থনার অর্থ যদি এরূপ মনে করি যে, ভাবশূন্য, ব্যাকুলতাশূন্য, কাতরতাশূন্য কতকগুলি বাক্যে পরমেশ্বরের উপর আত্মার উন্নতির সকল কর্তব্যভার অর্পণ করিয়া নিজে কিছুই না করা, তবে শক্তির বিকাশে ব্যাঘাত নিশ্চয়ই ঘটিবে। কিন্তু এ ত প্রার্থনা নয়। যে ব্যক্তি নিজে

কিছুই করে না, যাহার অন্তরে চরিত্রগঠনের জন্য সংগ্রাম নাই, সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য যাহার চেষ্টা নাই, যে আপনার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখে নাই, সে ভাব, ব্যাকুলতা ও কাতরতা কোথায় পাইবে? যে ব্যক্তি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও পারিয়া উঠিতেছে না, কেবল তাহারই অন্তরে যথার্থ প্রার্থনা জাগে। প্রার্থনায় চেষ্টার নিবৃত্তি বুঝায় না; বরং প্রাণপণ চেষ্টার অস্তিত্বই প্রকাশ করে। অতএব প্রার্থনা শক্তির বিকাশে ব্যাঘাত করা দূরে থাক, বরং শক্তিসকলকে সতেজ করে ও সুপথে রাখে। উহার গুণে আত্মার অজ্ঞাত শক্তিসমূহ ফুটিয়া উঠে। প্রার্থনায় যে জীবন-সংগ্রামে বল পাওয়া যায়, লোকভয় দূর হয়, সংসারিক লাভ-ক্ষতি-গণনাকে অগ্রাহ্য করিয়া সত্যের পথে চলার শক্তি পাওয়া যায়, উন্নত চরিত্র লাভে সহায়তা হয়, প্রেম-পুণ্য পবিত্রতার বৃদ্ধি হয়, সর্বোপরি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, ইহা সাধকগণের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। অধ্যাত্ম জগতের বিশেষজ্ঞগণ প্রার্থনাকে ধর্মজীবনলাভের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, সংসার-রাজ্যে যদি কর্মক্ষম ব্যক্তি ভিক্ষুক সাজিয়া অন্যের শ্রমার্জিত ধন চাহিয়া লইয়া নিজে ভোগ করে, তাহাতে নিশ্চয়ই অন্যায় হয়। কিন্তু পরমেশ্বরের নিকট আত্মিক সম্পদ চাওয়া তো সেরূপ নয়। আত্মিক সম্পদ পরমেশ্বরের শ্রমার্জিত সম্পত্তি নয়; এবং তাহা মানব-সন্তানকে দান করিলে তাঁহার ক্ষতিও হয় না, ক্লেশবোধও হয় না; বরং তিনি তাহা সকলকে দিবার জন্যই নিয়ত ব্যাকুল; দিতে

তাঁহার আনন্দ। গো-বৎস যখন মাতার স্তন্য পান করে, তখন কেবল বৎসেরই যে আনন্দ হয় তাহা নহে; মাতারও আনন্দ হয়। বৎস যেমন আনন্দে নাচিতে ও লেজ নাড়িতে থাকে, মাতাও তেমনি দুধ ছাড়িয়া দিয়া ও সন্তানের গা চাটিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। সন্তানের পাইয়া আনন্দ; মাতার দিয়া আনন্দ! আমরা যখন প্রার্থনা-যোগে পরম জননী হইতে আত্মার জীবন-সম্বল টানিতে থাকি, তখন তিনিও সেইরূপ 'দিয়া' আনন্দিতই হন। গাভীর দুগ্ধ যেমন সন্তানেরই জন্য, পরমেশ্বরের স্বরূপ, স্বভাব, করুণাও তেমনি মানবাত্মারই জন্য। মানবাত্মা প্রার্থনা-যোগে সে সকল গ্রহণ করিবে, ইহাই পরমেশ্বরের চিরন্তন অভিপ্রায়। অতএব, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কখনও সংসারের ভিক্ষাবৃত্তির সহিত তুলনীয় হইতে পারে না।

মহান পরমেশ্বরের নিকটে কৃপাভিখারী হইতে অপমান বা লজ্জার কথা কিছুই নাই। পিতার নিকট পুত্র প্রার্থীরূপে দণ্ডায়মান থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। রাজপুত্র যদি ক্ষুদ্রাশয় হইয়া আপনার মলিন বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য যার-তার দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায় তবে তার পদ-গৌরব নষ্ট হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি সে পিতা মহারাজের অনুগত ও মুখাপেক্ষী থাকে, তবে পিতার গৌরবে তার গৌরব হয়; এবং ক্রমেই তার মহত্ত্ব বর্ধিত হইতে থাকে।

যার নিজের বলিতে কিছুই নাই, অন্তরে বাহিরে যাহা-কিছু সম্বল সকলই যে ব্যক্তি কৃপার দানস্বরূপ পাইয়াছে, সে যে আবার নত হইতে অনিচ্ছুক, এর মত অহঙ্কার ও অকৃতজ্ঞতা

আর কি হইতে পারে ? এই অহঙ্কার ও অকৃতজ্ঞতা অন্তরে থাকিতে ঈশ্বরোপলব্ধি হইতেই পারে না। ঈশ্বরলাভ শব্দে আত্মার যে অবস্থা বুঝায়, অহঙ্কার ও অকৃতজ্ঞতা তাহার বিরোধী।

প্রার্থনা এক শ্রেষ্ঠ সাধন

'সাধন দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিব, কৃপার প্রার্থী হইব না' —এই কথা বলিলে প্রার্থনারূপ অন্যতম সাধনকে বাদ দেওয়া হয়। সকল প্রকার সাধনার মধ্যে প্রার্থনা এক অতি উচ্চাঙ্গ সাধন। ধর্মজীবনের আরম্ভে প্রার্থনা, মধ্যে প্রার্থনা, অন্তেও প্রার্থনা। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পরেও প্রার্থনা থাকিবে। চিরকালই মানবাত্মাকে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থীরূপে কাতর থাকিতে হইবে। অবশ্য জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনার বিষয়ের ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিবে। সাক্ষাৎ-কারের পরের প্রার্থনাই ত পূর্বের প্রার্থনা অপেক্ষা অধিক সত্য ও শুদ্ধ হইবার কথা। সন্তান যেমন পিতা বা মাতার গায়ে হাত দিয়া বাঞ্ছিত বস্তুটি চায়, পরমেশ্বরের নিকট তেমনি সাক্ষাৎভাবে চাওয়াই ত শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। সে প্রার্থনার সফলতা বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ মনে আসা অসম্ভব, কারণ তাহা পরমেশ্বরের আবির্ভাবের মধ্যে, তাঁহারই প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার অভিমুখে যায়। সেই পবিত্র আবির্ভাবের মধ্যে অহং বুদ্ধি বা মলিন বাসনার স্থান নাই।

প্রার্থনা-সাধনেরও গৌরব নেওয়া যায় না

প্রার্থনা সাধন বটে ; কিন্তু এই সাধনেরও গৌরব দিবার উপায় আমাদের নাই। কারণ, প্রার্থনা দ্বারা আমরা যাহা লাভ করি, তাহা যে প্রার্থনারই গুণে লাভ করি তাহা নহে। প্রার্থনা আত্মিক সম্পদ লাভের সর্ত বটে, কিন্তু কারণ নহে। শিশু হাঁ করিলে মাতৃস্তন্য পায় ; পক্ষীশাবক চক্ষু খুলিলে খাদ্যবস্তু পায়। হাঁ করা আহার পাওয়ার সর্ত ; কিন্তু কারণ নহে। কারণ মাতৃস্নেহ। প্রার্থনা আত্মার হাঁ করা বই আর কি ? প্রার্থনা না করিলে আমরা পরম জননীর বহু স্নেহের দান হইতে বঞ্চিত থাকি ; কিন্তু করিলে যাহা পাই, তাহা এই করারই ফল নহে ; পরম জননীর অপার অহেতুক স্নেহের ফল। তাঁহার সকল দানই কৃপা-প্রসূত।

আমাদের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষাও তাঁহার কৃপা বড়

প্রার্থনা বিষয়ে আরও ভাবিবার আছে। আমরা আপন মঙ্গলামঙ্গল সমুদয় বুঝিতে পারি না। প্রার্থনা করিতে গিয়া আমরা কেবল এতটুকু মঙ্গলই চাহিতে পারি যতটুকু আমাদের সামান্য জ্ঞানে মঙ্গল বলিয়া বুঝিয়াছি। তদতিরিক্ত কত মঙ্গল আমাদের পাইবার আছে, পাওয়া প্রয়োজন, তাহার ধারণাও এখন আমাদের নাই। শৈশবে বাল্যের জ্ঞানবুদ্ধি ধারণা করিবার বা চাহিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। বাল্যে

যৌবনের জ্ঞানবুদ্ধি আশাউৎসাহ, অথবা যৌবনে প্রৌঢ়ের সদ্বিবেচনা ও ধর্মভাব বুঝিবার ও প্রার্থনা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ জীবনের অধিপতি আমাদের চিত্তবৃত্তি সমূহকে ক্রমে ক্রমে বিকাশ করিয়া, যখন যাহা দিবার আপনি বুঝিয়া-সুঝিয়া দিতেছেন। তিনি জীবনতরণীর কাণ্ডারীরূপে না থাকিলে, আমরা শৈশব হইতে বাল্যে, বাল্য হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থায় ক্রমে অগ্রসর হইতে এবং প্রতি অবস্থার প্রাপ্য মঙ্গল লাভ করিতে পারিতাম না। সেইরূপ ভবিষ্যতের অনন্ত জীবন-পথে আমাদের কি কি প্রয়োজন হইবে, তাহাও আমরা বুঝিতে বা চাহিতে পারিতেছি না। জীবনাধিপতি স্বয়ং সে সকলের ব্যবস্থা করিবেন। অতএব, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে প্রার্থনা করিব বটে, কিন্তু তদপেক্ষা তাঁহার করুণার উপর অধিক ভরসা রাখিব। তাঁহার করুণা জীবনের প্রতি অবস্থায় আমাদের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষাও অনেক বড়।

কৃপা প্রতীক্ষার বস্তু নয়, সম্ভোগের বস্তু

কৃপা এত বড়; এবং কৃপাই জীবনের কাণ্ডারী। তথাপি সাধনরাজ্যে মানুষের করিবার অনেক আছে;—এ কথা বারংবার বলিতেছি। এক শ্রেণীর কৃপাবাদী আছেন, যাঁহারা মনে করেন—মানুষকে কিছুই করিতে হইবে না, ভগবৎকৃপা শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক একদিন সহসা আসিয়া উদ্ধার করিবে। ইঁহারা কৃপাকে ভবিষ্যতের গর্ভে স্থাপন করিয়া,

বর্তমানে নাস্তিক জীবন যাপন করিয়া সন্তুষ্ট। ইঁহারা কৃপার পরিচয় পান নাই, কৃপা ইঁহাদের নিকট অজ্ঞাত, অনাস্বাদিত; সুতরাং কল্পনা-মাত্র। যাঁহারা কৃপাকে আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহারা কখনও সাধনা বিনা থাকিতে পারেন না। তাঁহারা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন লইয়াই থাকেন; সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ, সাধুসঙ্গ ও সদালোচনা তাঁহাদের নিত্য-কার্য; আত্মপরীক্ষা, প্রবৃত্তিদমন, সত্য-নিষ্ঠা, কর্তব্যপালন, নিঃস্বার্থ সেবা ইত্যাদি দ্বারা চরিত্রের নির্মলতা সম্পাদনে তাঁহারা সর্বদাই মনোযোগী; স্তুতিবন্দনা, প্রার্থনা, স্মরণ, কীর্তনাদি পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র আকস্মিক কৃপার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অনুরাগ তাঁহাদিগকে নিষ্ক্রিয় থাকিতে দেয় না। বস্তুতঃ সমগ্র জীবন সাধনাময় হয়, ইহাই ভক্তদের আকাঙ্ক্ষা। জীবনের কোনো অংশ যেন নাস্তিকতার মধ্যে না থাকে; দিবারাত্রির কিঞ্চিৎ সময়ও যেন জীবনস্বামীকে ভুলিয়া না কাটে; একটি চিন্তা, একটি বাক্য, একটি কার্যও যেন তাঁহাকে বাদ দিয়া না হয়—এই তাঁহাদের লক্ষ্য। কিন্তু তাঁহারা সকল সাধনারই সঙ্গে কৃপার অনুভবকে মিশ্রিত রাখেন। তাঁহাদের নিকট কৃপা কেবল ভাবী কালে নহে, বর্তমানে; কৃপা কেবল প্রতীক্ষার বিষয় নহে; সম্ভোগের বস্তু। কৃপার নিত্য উপলব্ধি তাঁহাদের সাধনাকে অহঙ্কারশূন্য ও মধুময় করে, এবং যিনি সাধনার লক্ষ্য, সর্বদা তাঁহাকে নিকট করিয়া রাখে।

আকস্মিক কৃপা

সাধন বিনা আশ্চর্যরূপে পরমেশ্বরের কৃপালাভের দৃষ্টান্তও জগতের ইতিহাসে বিরল নহে। যে ব্যক্তি কোনো দিন পরমেশ্বরকে চান নাই, তাঁর ভাবনা ভাবেন নাই, তাঁকে পাবার জন্য কোনো প্রকার যত্ন করেন নাই, তিনিও সহসা পরমেশ্বরের প্রকাশ অনুভব করিয়াছেন, এরূপ শুনা যায়; কিন্তু ইহাও শুনা যায় যে, তাঁহার সেই দর্শন ক্ষণিক হইয়াছিল। প্রাণে ব্যাকুলতার উদ্দীপনের জন্য পরমেশ্বর এইরূপ ক্ষণিক দর্শন দিয়া থাকেন। তাঁহার প্রেম, পবিত্রতা, সৌন্দর্য অথবা আনন্দের কোনও একদিক অকস্মাৎ বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশ করিয়া তিনি অনেক ধর্ম-বিমূখ আত্মাকে আপনার জন্য আকুল করিয়াছেন। এজন্যই ভক্তেরা বলিয়া থাকেন—যে তাঁকে চায়, সে ত পায়ই; যে না চায়, সেও তাঁকে পায়। কথাটি সত্য। কিন্তু যিনি না চান তাঁর যে পাওয়া, তাহা ঐরূপ ক্ষণিক পাওয়া; পরমেশ্বর তাঁহার আত্মিক জাগরণের জন্য দয়া করিয়া একবার দেখা দেন মাত্র। এর পরও যদি সেই ব্যক্তি না চান, যদি সাধনভজনে রত না হন, তবে তিনি বঞ্চিত হন। আর, যদি সেই আকস্মিক দর্শনে আকুল হইয়া আত্মসংশোধনে মনোযোগী হন ও বিবিধ সাধনা-যোগে তাঁহার সহিত যোগযুক্ত থাকিতে সচেষ্ট হন, তবে তিনি দিন-দিন আত্মার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতর রূপে তাঁহাকে পান ও সম্ভোগ করেন।

কৃপা অহেতুকী

এইরূপ বিনা চাওয়ায় দর্শন দিয়া পরমেশ্বর যে মোহমুগ্ধ মানুষকে আকুল করেন, ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে, তাঁহার কৃপা অহেতুকী। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক সাধকেরই সাধনারম্ভের ইতিহাস এইরূপ। সকলকেই করুণাময় পরমেশ্বর কোনো না কোনো উপায়ে প্রথমে জাগ্রত করেন, পরে মানুষ তাঁহাকে অন্বেষণ করে। তাঁহার মানুষকে চাওয়া পূর্বে; মানুষের তাঁহাকে চাওয়া পরে। অতএব, কৃপাই সাধনার জননী; সাধনা কৃপার জননী নহে।

কৃপা পূর্বে, সাধনার উৎপত্তি পরে

জীবদেহে চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি আদিতে কিরূপে হইল, এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানরাজ্যে নাকি এইরূপ একটি মতবাদ আছে যে, অন্ধজীবের শরীরের উপর সূর্যালোক ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে চক্ষুর সৃষ্টি হইয়াছে; বধির শরীরে শব্দতরঙ্গ ক্রমাগত আঘাত করাতে কর্ণের উদ্ভব হইয়াছে; ইত্যাদি। কথাটি সত্য হউক বা না হউক, আত্মার বৃত্তিসকল সম্বন্ধে ইহার অনুরূপ কথা সত্য বলিয়া মনে হয়। পরমেশ্বরের মহিমা বিশ্বরাজ্যে আদিকাল হইতে আছে বলিয়াই মানবের জ্ঞানচক্ষু তাঁহার দিকে উন্মীলিত হইয়াছে এবং আমরা তাঁহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। তাঁহার অসীম স্নেহ পূর্ব হইতে আছে বলিয়াই আমাদের মধ্যে ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হইয়াছে এবং

আমরা আপন ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেছি।

বস্তুতঃ আমরা পরমেশ্বরের জন্য যত প্রকার সাধনা করি, তিনিই সে সকলের প্রবর্তক। তাঁহার প্রভাব ও তাঁহার আকর্ষণই চিরকাল মানুষকে সর্বপ্রকার সাধনে প্রবৃত্ত করিতেছে। মানুষ যে তাঁহাকে চায়, না চাহিয়া পারে না বলিয়াই চায়; তিনি পূর্ব হইতেই মানুষকে চাহিতেছেন বলিয়াই চায়। যেমন, গ্রহগণ যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সূর্যের আকর্ষণে ও প্রভাবেই করে, তেমনি মানুষও ঈশ্বরের সাধনা তাঁহার আকর্ষণে ও প্রভাবেই করে। যাহা আমরা তাঁহারই প্রভাবে, তাঁহারই গুণে করি, তজ্জন্য গৌরব নেওয়া আমাদের মিথ্যা অভিমান। যতক্ষণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আপনাকেই দেখি, ততক্ষণ সাধনার গৌরব করা সম্ভব হয়; কিন্তু তাঁহাকে সাধনার প্রবর্তকরূপে দেখিলে আর তজ্জন্য গৌরব করা যায় না।

মানুষের জন্য ঈশ্বরের সাধনা

পরমেশ্বর আমাদের সম্বন্ধে পূর্ব হইতে ভাবিতেছেন, এবং আমাদিগকে পূর্ব হইতে চাহিতেছেন। ইহা হইতে এই তত্ত্বটি আসে যে, আমাদের জন্য তাঁর সাধনা আছে; এবং সেই মহাসাধনার গুণেই আমরা বাঁচিয়া আছি ও আমাদের আত্মার বিকাশ সম্ভব হইতেছে। তাঁহার বিরামহীন চিরন্তন সাধনা আমাদের সমুদয় চঞ্চল সাধনার প্রতিষ্ঠাভূমি।

আমরা শৈশবে যখন পরমেশ্বরকে চেনা ও তাঁহার সাধনা করা দূরে থাক, আপনাকেও ব্যক্তিরূপে অনুভব করিতে পারি নাই, আপনার প্রয়োজন কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই, তখনও তাঁহার মঙ্গলময়ী ভাবনা আমাদের জন্য ছিল। তিনি আমাদের প্রয়োজন বুঝিয়া আমাদের জন্য সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আত্মার রাজ্যে আজও আমরা শিশু। সদ্যোজাত শিশু যেমন দিবারাত্রির তেইশ ঘণ্টাই ঘুমায়, সময় সময় অল্পক্ষণ মাত্র চক্ষু উন্মীলন করে, এবং তাহার সেই ক্ষণিক জাগরণও যেমন বোধশূন্য, প্রায় নিদ্রারই তুল্য, আমাদের আত্মার অবস্থাও কি তদ্রূপ নয়? আমরা অনেকেই দিবসের তেইশ ঘণ্টা বা ততোধিক কাল পরমেশ্বর সম্পর্কে নিদ্রিত থাকি।

অথচ, এই মোহনিদ্রায় নিদ্রিত আত্মাগণের জন্য পরমেশ্বরের স্নেহময়ী মঙ্গলময়ী ভাবনার বিরাম নাই। আমরা কোন সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহাকে চিনিব, ভালবাসিব, তাঁহার অনুগত হইব ও তাঁহার ধ্যান করিব, সেই আশায় তিনি অবিরাম আমাদিগকে ধ্যান করিতেছেন। আমাদের জন্য তাঁহার এই চিরন্তন সাধনার কথা স্মরণ করিলে, তাঁহার জন্য আমাদের যে ক্ষণিক, ভক্তিহীন, ঔদাস্যময় সাধনা, তাহা অতিশয় তুচ্ছ হইয়া যায়। এই তুচ্ছ সাধনার নাম করিতেও লজ্জিত হইতে হয়। এরই গুণে আমরা তাঁহাকে লাভ করিব ও ধরিয়া থাকিব, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

আমরা তাঁহাকে স্বয়ং পাইতেও পারি না, পাইলে ধরিয়া থাকিতেও পারি না। আমরা বিস্মরণশীল, নিদ্রালু, সুখ-

প্রিয় ও বিদ্রোহপরায়ণ জীব। আমরা তাঁহাকে অবিচ্ছেদে ধরিয়া থাকিব কিরূপে? তাই একজন ব্যাকুল ভক্ত (স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন) সঙ্গীতে প্রার্থনা করিয়াছেন—"ও মা! হস্ত আমার হলেও শিথিল, তুই আমারে ছাড়িস্ নে গো।" আমরা একবার তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেও যে আবার পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা কেবল এই জন্য যে, তিনি স্বয়ং অপার কৃপাগুণে আমাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছেন। এইখানেই আমাদের আশার ভিত্তি। আমাদের অস্থির সাধনার উপরে আশা কখনই অটল-ভাবে স্থাপিত হইতে পারে না।

মানুষের সাধনার মূল্য

তবুও যে আমাদের এই তুচ্ছ সাধনারও মূল্য আছে, তাহা এই জন্য যে, আত্মা গভীর ব্যাকুলতা ও কঠিন পরিশ্রম দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হইলে আমরা পরমেশ্বরের মর্যাদা বুঝিতে ও তাঁহাকে সমুচিতরূপে সম্ভোগ করিতে সমর্থ হই না। অনুরাগের প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ করিয়াছি; তথাপি আবারও বলিতেছি যে, আত্মার ঈশ্বরমুখীর বৃত্তিসকল যে পরিমাণে জাগ্রত ও বিকশিত হয়, সেই পরিমাণেই তাঁহাকে গ্রহণ করা ও সম্ভোগ করা সম্ভব হয়। নিদ্রিত অবিকশিত আত্মা তাঁহাকে গ্রহণ ও সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে কিরূপে? এতএব, আমাদের সাধনার ব্যবস্থাও আপনাকে অভিব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে, কৃপাবশতঃই করিয়াছেন।

আর একটু বিস্তৃত করিয়া বলি। আমরা যে জড়জগতে

শারীরিক জীবন যাপন করিতেছি, দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলকে খাটাইয়া এবং জীবিকাদি উপার্জনচ্ছলে পরিশ্রম করিয়াই সেই জীবনকে অনুভব ও আস্বাদন করিতেছি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে খাটাইবার ও পরিশ্রম করিবার ব্যবস্থা না থাকিলে আমরা সুখদুঃখময় এই জীবনকে কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিতাম না। অতএব, আমাদের জন্য পরিশ্রমের ব্যবস্থা জীবন-দাতার অশেষ কৃপা। সেইরূপ আত্মার জগতে উচ্চতর জীবন লাভ করিয়া জ্ঞান, প্রীতি, মঙ্গলেচ্ছা প্রভৃতি বৃত্তিকে খাটাইয়া, সাধনা ও উন্নতির ছলে সেই জীবনকে যে অনুভব করিতেছি, ইহাও তাঁহার ততোধিক কৃপা।

পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে, আমাদের দিক হইতে কিছু না চাহিয়াও হয়ত আপনাকে দান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইলে সেই সুমহৎ দান গ্রহণ ও সম্ভোগ করিবার ক্ষমতা আমাদের হইত না। তিনি ত আদিকাল হইতে এই জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াই রহিয়াছেন; কিন্তু জড় জগৎ তাঁহাকে অনুভব করিতে পারিল না. পশুপক্ষীও তাঁহাকে চিনিতে সক্ষম হইল না, মানবকুলের মধ্যেও যাঁহারা আত্মার সম্পর্কে নিদ্রিত, তাঁহারা তাঁহার পরিচয় পাইলেন না; কেবল নীতিধর্মে, জ্ঞানে-প্রেমে, নিঃস্বার্থতায় ও সেবায় জাগ্রত মানুষেরাই তাঁহাকে জানিতে ও গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেছেন। সরোবরের প্রস্ফুটিত কমলসমূহ যেমন বিমল সূর্যকিরণকে গ্রহণ করে, জাগ্রত ভক্তেরা তেমনি আপন আপন বিকশিত আত্মার দ্বারা পরমেশ্বরকে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

কি দৈহিক জীবনে, কি আত্মিক জীবনে, শক্তির ব্যবহারে, অর্থাৎ পরিশ্রমে ও সাধনাতেই আমাদের জাগরণ; তাহাতেই আমাদের জীবনের বোধ ও জীবনের আস্বাদন সম্ভব হয়। শক্তির ব্যবহার ভিন্ন জীবন শূন্যতা মাত্র।

তাই বলিতেছিলাম, জীবন যেমন পরমেশ্বরের কৃপার দান, পরিশ্রম ও সাধনাও তেমনি তাঁহার কৃপার ব্যবস্থা। পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা আমরা পরমেশ্বরের হৃদয়ে কৃপা উৎপন্ন করি না, অথবা তাঁহা হইতে কৃপা ক্রয় করি না; কিন্তু যে কৃপা অকারণে, কেবল তাঁহার প্রেম-স্বভাবের গুণে, চিরদিনই ছিল ও আছে, তাহা দেখিবার ও অনুভব করিবার যোগ্য হই। দৈহিক রাজ্যে পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিলেও সেই জীবিকা যেমন জীবনদাতারই দান, বরং পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করাতে সেই দান যেমন মূল্যবান ও মিষ্ট হয়, তেমনি আত্মিক রাজ্যেও সাধনা দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তাহা কৃপাময়ের কৃপারই দান; এবং সাধনার সহযোগে লাভ করাতেই সেই দান মূল্যবান ও মিষ্ট হয়।

দৈহিক পরিশ্রম ও আত্মিক সাধনার দ্বারা আমরা জীবনাধিপতি পরমেশ্বরের কোনও উপকার করি না; কেবল আমরা যে বাঁচিয়া আছি, এবং তিনি যে আমাদের জন্য আছেন, এই দুই মহাতত্ত্বের রসাস্বাদন করি মাত্র।

এইরূপে দেখা হইতেছে যে, সাধনার আবশ্যকতা পূর্ণভাবে স্বীকার করিলেও কৃপার অহেতুকীত্ব নষ্ট হয় না; সাধনার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কৃপা সম্পূর্ণ অহেতুকী। কৃপাই জীবন দিয়াছে;

এবং কৃপাই জীবনের অনুভব ও রসাস্বাদন যোগাইবার জন্য পরিশ্রম ও সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছে।

পরমেশ্বরের ব্যস্ত প্রেম

আবার আমাদের জন্য সাধনার ব্যবস্থা করিয়াও পরমেশ্বর নিরস্ত হন নাই। আমাদের এই তুচ্ছ সাধনার সহায়তা করিবার জন্য তিনি সর্বদা কাছে-কাছে রহিয়াছেন। যেমন শিশুসন্তানকে হাঁটিতে শিখাইবার সময় মাতা আপনার স্নেহময় কোমল হাত দুখানি বাড়াইয়া তাহার কাছে কাছে থাকেন, তেমনি আমাদের জীবনে সকল সাধুচেষ্টার সহায় হইয়া জগজ্জননী সর্বদাই বর্তমান। তাঁহার করুণা নিত্য কতরূপে আমাদের সহায়তা করিতেছে তার বর্ণনা ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধে কেমন করিয়া করিব?

যুগযুগান্তরের কত জ্ঞান, কত উপদেশ, কত মহৎ দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং প্রয়োজনমত যোগাইতেছেন! কত সাধুসঙ্গ ও ভক্তমণ্ডলীর সাহায্য আমাদিগকে সর্বদা দিতেছেন! কত উপাসনা ও উৎসবের দ্বারা আমাদের প্রাণ গলাইতেছেন; এবং জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যের উন্নত আদর্শ প্রাণে জাগাইয়া আমাদিগকে আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন! দিবানিশি সঙ্গে থাকিয়া ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রতি ঘটনায় কত শিক্ষা দিতেছেন!

আমাদের এক একটি জীবনে তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ করুণার কাহিনী অফুরন্ত! তাঁহার স্নেহ প্রতি অবাধ্য সন্তানের জন্য

নিয়ত ব্যস্ত। কোনো দুঃখিনী জননী আপনার বিপথগামী সন্তানকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে যেমন ব্যাকুল হয়, জগজ্জননী আমাদের প্রত্যেকের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য তেমনি ব্যাকুল। অগাষ্টিন চরিত্রভ্রষ্ট হইলে তাহার সংশোধনের জন্য সাধ্বী মাতা মণিকা বহু বৎসর ধরিয়া যে আকুল ক্রন্দন ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে পুত্রকে ফিরাইয়া সাধুভক্তদের পথে আনিয়াছিলেন, ইহার মূলে কাহার প্রেরণা ছিল?

প্রতি গৃহে সন্তানগণের সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রতার জন্য জনকজননীর যে চিন্তা, তাহা কার চিন্তার পরিচয় দেয়? পতির জন্য পত্নীর, পত্নীর জন্য পতির, ভাইবোনের জন্য ভাইবোনের, বন্ধুর জন্য বন্ধুর যে ব্যগ্র উৎকণ্ঠা, তাহা কার উৎকণ্ঠা, যুগে যুগে দেশে-দেশে দুর্দশাগ্রস্ত নরনারীর জন্য সাধু-সাধ্বীদের যে বেদনা, প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও ক্লেশবহন, এ সকলের মধ্যে কার প্রেম? কে জগদ্বাসীর উদ্ধারের জন্য সিদ্ধার্থকে রাজসিংহাসন হইতে নামাইয়াছিল, যিশুকে ক্রুশে লইয়া গিয়াছিল, মোহম্মদকে ক্ষেপাইয়াছিল, চৈতন্যকে সন্ন্যাসী করিয়াছিল?

সেই করুণাময়েরই ব্যস্ত প্রেম এইরূপ সহস্র আকারে আসিয়া আমাদের উন্নতির সহায়তা করিতেছে। আমরা তাঁহার দিকে একপদ অগ্রসর হইতে না হইতে, তিনি শতপদ অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে ধরিতেছেন। বস্তুতঃ তিনি আমাদের নামমাত্র সাধনার নিত্য সহায়।

তাঁহার প্রদত্ত কার্যগত শিক্ষা

আরও বলিব কি? আমরা সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় যে সাধনা করি, তাহাতে আত্মার যতটা বিকাশ হয়, জীবনের ঘটনাবলীর চাপে বিধাতা যে শিক্ষা দেন, তাহাতে অনেক সময় অধিক বিকাশ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, একজন সাধক অনাসক্তি সাধনের জন্য, 'সংসার অনিত্য' এই বাক্য প্রতিদিন সহস্রবার জপ করিবার ব্রত লইয়াছেন। ইহা তাঁহার সজ্ঞান স্বেচ্ছাকৃত সাধনা। কিন্তু যতদিন তাঁহার স্ত্রীপুত্র বিত্তবিভব সমুদয় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, ততদিন এই সাধনার ফল তাঁহার মনের উপরিভাগে ভাসিয়া থাকে। কিন্তু যখন বিধাতা তাঁহার সুখের ঘরে দুঃখ আনেন, যখন তিনি পুত্র বা বিত্ত কাড়িয়া লন, তখন সে ব্যক্তির প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয়। সংসার যে বাস্তবিকই অনিত্য, দুঃখের কঠিন আঘাতে তখন সেই ব্যক্তি সত্যভাবে তাহা অনুভব করেন। তখন তাঁর সেই জ্ঞান আর মনের উপরিভাগে ভাসিয়া বেড়ায় না, তাঁকে গভীরে তলাইয়া লইয়া যায়; একেবারে তাঁর মর্মগত হয়।

আমাদের একজন ভক্তিভাজন আচার্য পরিজনবর্গকে 'শ্মশানে চড়াইবার' সাধন আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই, প্রতিদিন মনে করিতে হইবে, যেন শ্মশানে অগ্নি জ্বলিতেছে, এবং যেন আমার পত্নী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি একে একে মরিতেছেন এবং আমি যেন সেই অগ্নির মধ্যে তাঁহাদের মৃতদেহ একে একে নিক্ষেপ করিতেছি। বন্ধুগণের

মধ্যে কেহ-কেহ এই সাধনা গ্রহণ করিলেন ; হয়ত কিছু উপকারও পাইলেন। কিন্তু এই কল্পনাময় সাধন অপেক্ষা কি সত্যের শিক্ষা অধিক মর্ম্মস্পর্শী নয় ? এই কল্পনামূলক সাধনদ্বারা একব্যক্তি শরীরে অনিত্যতা বিষয়ে পাঁচবৎসরে যে জ্ঞান লাভ করিবেন, বিধাতার বিধানে যাঁহার সত্য সত্য পত্নীবিয়োগ, পুত্র-বিয়োগ বা কন্যাবিয়োগ হইবে, তিনি একমাসে নিশ্চয়ই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান পাইবেন। বিধাতৃ-প্রদত্ত কার্যগত শিক্ষা এইরূপ।

বলাবাহুল্য, সকল সাধনে উক্তরূপ কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না। এ স্থলেও কেবল শ্মশানের অগ্নি ও তাহাতে মৃতদেহ নিক্ষেপ, এইটুকু মাত্র কল্পনা। পরিবারবর্গের সহিত দৈহিক সম্পর্ক যে অস্থায়ী, ইহা ত কঠোর সত্য। এই সত্য সর্বদা স্মরণ রাখিবার চেষ্টা করা এবং সকল প্রকার দুর্ঘটনার জন্য মনকে পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, এরূপ চেষ্টা দ্বারা আমাদের যতটা অনাসক্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়, বিধাতার প্রদত্ত কঠিন আঘাতে তদপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। সে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে কৃপারই দান।

দুঃখের শিক্ষা অপেক্ষা সত্য শিক্ষা আর নাই। দুঃখে গড়া মানুষকে দেখিলেই চেনা যায়। তাঁহার স্বভাব নম্র ও গম্ভীর। তিনি অন্যের দুঃখে সমবেদনায় ব্যথিত হন। তিনি অপরের অনাবশ্যক সমালোচনা করেন না। দুঃখের চাপে তাঁহার অন্তরে জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইয়াছে ; হৃদয়ে অমৃতরস সঞ্চিত হইয়াছে। দুঃখে যেমন পরমেশ্বরের সহিত পরিচয় হয়, সুখে তেমন হয় না।

একপ্রকার খেলার পুতুল দেখিয়াছি ; তার দুহাতে দুখানা ছোট ছোট করতাল। সে সাধারণ অবস্থায় চক্ষু মুদিয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহাকে হাতে লইয়া বুকে অঙ্গুষ্ঠের চাপ দেওয়া যায়, তখন সে চোখ খুলিয়া চায় এবং করতাল বাজাইতে থাকে। আমরা যেন পরমেশ্বরের হাতে এ প্রকার পুতুল। যখন তিনি বুকে দুঃখের চাপ দেন, তখন আমাদের মুদিত নয়ন উন্মীলিত হয় ; আমরা তখন চাহিয়া তাঁহাকে দেখি এবং সত্যালোকে পাইয়া আনন্দে করতাল বাজাইতে থাকি। বিধাতার প্রদত্ত এই শিক্ষার কাছে আমাদের এই স্বকৃত সাধনার মূল্য কতটুকু ? তার জন্য আবার অহঙ্কার কি ?

জীবনে জীবনে কি তাঁহার এই শিক্ষাদান নিত্য চলিতেছে না ? যাঁহারা এই পবিত্র শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা বলেন—ধন্য করুণাময় ! আমার কোন্ গুণে তুমি আমাকে দুঃখ ভোগের জন্য মনোনীত করিলে, যার ফলে আমি তোমার পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইলাম ?'

তাঁহার পরিচালিত অন্যপ্রকার সাধনা

দুঃখের চাপ ছাড়াও পরমেশ্বর অন্য এক প্রকারে আমাদের দ্বারা সাধনা করাইয়া থাকেন। সময়-সময় এক একটা চিন্তা বা ভাব আমাদের মনকে এমন পাইয়া বসে, অথবা জগৎকে বা মানবজীবনকে দেখিবার একটা ক্রম সহসা প্রকাশিত হইয়া মনকে এমন অধিকার করে যে, ইচ্ছা করিলে তাহাকে ছাড়ান যায় না। মাসের পর মাস, হয়ত বা বৎসরের পর বৎসর,

সেইটিই ধ্যান-জ্ঞান হইয়া যায়; আপনা-আপনি তাহার সাধন চলিতে থাকে; এবং সেই সাধনের ফলে জীবন উন্নত হইতে থাকে। ইহাকে 'সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরেরই পরিচালিত সাধন' ব্যতীত আর কি বলিব? এরূপ সাধনে সহজে যে ফল লাভ হয়, আপনার সহিত আপনি সংগ্রাম করিয়া আমরা তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হই না।

সাধনা ও ব্রহ্মকৃপা পরস্পরের বহির্ভূত নয়

আর অধিক বলিব না। এক্ষণে মানুষের সাধনা ও ব্রহ্মের কৃপা, এ দুয়ের সামঞ্জস্য কিরূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বোধ করি এইটি পরিষ্কার হইয়াছে যে, পরিশ্রম ও সাধনা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। আমাদের শক্তি, জ্ঞান, পাপপুণ্যবোধ, ঈশ্বরানুরাগ, সকলই কৃপাময়ের কৃপার দান। আমাদের নিজস্ব কিছুই নাই যাহা লইয়া আমরা তাঁহার সম্মুখে 'একজন-কেহ' হইয়া দাঁড়াইতে পারি। আমাদের ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মনিরপেক্ষ নয়।

সুতরাং তাঁহার সহিত আমাদের কোনো বিষয়েই ভাগাভাগি চলিতে পারে না। 'এই আমার সাধনা, ঐ তাঁহার কৃপা', এরূপ মনে করাতে ভাগাভাগি হয়। ব্রহ্ম অনন্ত, অসীম; আমরা ক্ষুদ্র সসীম। তাঁহার সহিত ভাগাভাগি করিলে অর্থাৎ আমাদের নিজস্ব কিছু আছে ভাবিলে, তাঁহার অনন্ততা খণ্ডিত হয়; তিনি আর অসীম ব্রহ্ম থাকেন না, সসীম জীব হইয়া যান। সকল সসীমই অসীমের আশ্রিত ও অন্তর্ভুক্ত।

মহাত্মা যিশুর কথিত গল্পের সেই অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচারী পুত্রের ন্যায় আমরা অনন্ত পরমেশ্বরকে বলিতে পারি না— "হে পিতঃ! আমার প্রাপ্য সম্পত্তি আমায় দাও; আমি অন্যত্র যাইয়া স্বাধীন জীবন যাপন করিব'। আমাদের নিজের বলিবার সম্পত্তি কোথায়, যা এইরূপে দাবী করিতে পারি? জগতে তেমন স্থানই বা কোথায়, যা পিতার রাজ্য নয়? শরীরে বা মনে তেমন শক্তিসামর্থ্যই বা কোথায়, যার সাহায্যে স্বাধীন পিতৃ-নিরপেক্ষ জীবন যাপন করা সম্ভব হইতে পারে? এইরূপে পরমেশ্বরের সহিত পার্থক্য স্থাপন করা, 'তিনি আমার বাহিরে, আমি তাঁহার বাহিরে' এরূপ দ্বৈতবুদ্ধি অন্তরে পোষণ করার নামই অহঙ্কার ও মমকার। ইহাই নাস্তিকতার মূল। এবম্বিধ দ্বৈতবুদ্ধি থাকা পর্যন্ত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতে পারে না। 'তিনি দূরে', 'তিনি স্বর্গে', 'তিনি অতীতকালে আসিয়াছিলেন বা ভবিষ্যতে আসিবেন', এ সকল ভাবই প্রকাশ করে যে, তিনি আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অপরিচিত রহিয়াছেন। তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে হইলে অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচারী সন্তানকে পিতার আলয়ে ফিরিয়া আসিতে হয়; অর্থাৎ আপনার পৃথক সম্পত্তির, পৃথক রাজ্যের ও পৃথক শক্তির ভ্রান্তি—এক কথায় 'ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ ভাব'—পরিত্যাগ করিতে হয়—অহঙ্কার ও মমকার, স্বেচ্ছা ও স্বাতন্ত্র্য, ছাড়িতে হয়। অতএব, দ্বৈতবুদ্ধি পরিত্যাগই সাধনা ও ব্রহ্মকৃপার সামঞ্জস্য উপলব্ধির উপায়।

জীবনে পরমেশ্বরের সর্বময় অধিকার অনুভব না করার

অবস্থায়, অথবা তাহা ভুলিয়া থাকার কালে, আমরা এমন অনেক কথা বলি, যাহা তত্ত্বতঃ সত্য নয়। আমরা অনেক সময় বলি—'আমাদের শক্তি প্রথমে প্রয়োগ করিতে হইবে, তবে ত ঈশ্বর কৃপা করিবেন'। এ কথায় প্রকারান্তরে বলা হয়, আমাদের ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ শক্তি কিছু আছে। এবং ইহাও বলা হয়, বর্তমানে ঈশ্বরের কৃপা নাই পরে কৃপা আসিবে। যেন প্রথমে আমি ও আমার সাধনা, পরে তিনি ও তাঁহার কৃপা! আমরা এ বিষয় অনেক সময় এই দৃষ্টান্ত দিয়া থাকি—কৃষক যেমন কৃষিকার্যে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিয়া, যথাকালে বারিবর্ষণাদির জন্য ভগবানে নির্ভর করে, সাধন ক্ষেত্রেও তদ্রূপ আমাদিগকে আপন কর্তব্য সাধ্যানুসারে করিয়া কৃপার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। এ প্রকার উক্তিতে পরমেশ্বরের সহিত ভাগাভাগির ভাব, অর্থাৎ দ্বৈতবুদ্ধিই প্রকাশ পায়। এ ভাবে সাধনা ও ব্রহ্মকৃপার সামঞ্জস্য হয় না। যেমন পিচকারীর ভিতরে কতক জল ও কতক বাতাস থাকে, সাধনা ও কৃপা তেমনি পাশাপাশি, পরস্পরের বাহিরে থাকিয়া যায়, মিশ্রিত হয় না। একটিকে বাড়াইতে গেলে অপরটি কমিয়া যায়।

প্রকৃত সামঞ্জস্য

সাধনা ও ব্রহ্মকৃপার প্রকৃত সামঞ্জস্য তখনই অনুভব করা যায়, যখন জীবনকে ব্রহ্মের মধ্যে দেখা যায়; যখন আপনার শক্তি ও কার্যকে তাঁহারই বলিয়া জানা যায়। তখন ব্রহ্মের

প্রকাশে সাধক লুপ্ত হয় না; সমর্পিত শুদ্ধ জীবন লাভ করেন। তখন পূর্ণ কৃপানুভূতির আগমনে সাধনাও লোপ পায় না, বরং তদ্দ্বারা সংসিক্ত হইয়া অভিমানশূন্য ও পরিশুদ্ধ হয়। এইরূপে ষোল আনা কৃপানুভূতির সহিত ষোল আনা সাধনা মিশ্রিত হইয়া উভয়ে একত্র অবস্থান করে।

মানুষের ধর্মজীবনের উন্নতির ক্রম এইরূপ:—প্রথমে পূর্ণ নাস্তিকতার অবস্থায় মানুষ নিজ জীবনে কেবল আপনার কার্যই দেখে, ঈশ্বরের কার্য কিছুই দেখে না। পরে আংশিক আস্তিকতার অবস্থায় আপনার কার্যকে পরমেশ্বরের কার্য হইতে পৃথক ভাবিয়া তাঁহার সহিত ভাগাভাগি করে। অবশেষে, দিব্য জ্ঞানের উদয়ে, আপনার শক্তি ও কার্যকে তাঁহার কার্যের অন্তর্গত জানিয়া, পূর্ণ আত্মসমর্পণে তাঁহার হইয়া যায়।

আমরা ব্রহ্মের সহিত মানবাত্মার যে সম্বন্ধ বুঝিয়াছি, তাহারই মধ্যে, পরিশ্রম ও নির্ভরের, সাধনা ও কৃপানুভূতির প্রকৃত সামঞ্জস্য নিহিত আছে। আমরা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে সর্বথা একই মনে করি না। সুতরাং আমাদের দৈহিক রাজ্যে পরিশ্রম বা কর্মের, এবং আত্মিক রাজ্যে উপাসনা বা সাধনার, স্থান রহিয়াছে। আবার আমরা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক বা পরস্পরের বাহিরেও মনে করি না; জীবাত্মাকে পরমাত্মার আশ্রিত ও অন্তর্ভুক্ত মনে করি; সুতরাং আমাদের পূর্ণ আত্মসমর্পণ, পূর্ণ নির্ভর ও পূর্ণ কৃপা-স্বীকারের স্থান রহিয়াছে।

প্রাণকে ব্রহ্মপদে রাখিয়া হস্তকে তাঁহার কার্যে নিযুক্ত করা

যায়, ইহা আমরা স্বীকার করি। সংসার-কর্ম করিয়া জ্ঞানী ও ভক্ত হওয়া যায় এবং জ্ঞানী ও ভক্ত হইয়া সংসার-কর্ম করা যায়; ইহাও আমরা স্বীকার করি। সেইরূপ সাধনা করিয়াও পূর্ণ মাত্রায় কৃপাবাদী হওয়া যায়, এবং কৃপাবাদী হইয়াও পূর্ণমাত্রায় সাধনা করা যায়, এ কথাও আমাদের স্বীকার করা অনিবার্য। সকল বিষয়ের সামঞ্জস্যই এক মূল ভিত্তির অর্থাৎ জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সম্বন্ধের জ্ঞান যতই উজ্জ্বল হইবে, ততই আমাদের চিত্তে এ সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য পরিস্ফুট হইতে থাকিবে।

ব্রাহ্মসমাজের সকল সাধনাই ব্রহ্ম ও মানবাত্মার ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অভেদ এই যে, তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, ন্যায়বান, মঙ্গলস্বরূপ, প্রেম-স্বরূপ, শুদ্ধস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও শান্তস্বরূপ; মানবাত্মাও শুদ্ধাবস্থায় তাই। কিন্তু সেই সঙ্গে চিরন্তন ভেদ এই যে, তিনি সর্ববিষয়ে অনন্ত; মানবাত্মা সর্ববিষয়ে সান্ত। আর সেইজন্যই তিনি 'অপাপবিদ্ধ', মানবাত্মা 'পাপবিদ্ধ'। এই ভেদকে distinction বলিতে বাধা দেখা যায় না; কিন্তু ভাগ বা division নহে। আরাধনা ও প্রার্থনা যোগে আমাদের অন্তরে এই তত্ত্ব ক্রমে উজ্জ্বল হওয়া চাই।

জীবন কৃপা-সাগরে নিমজ্জিত

আমাদের জীবন যে কেমন ব্রহ্ম-কৃপার সাগরে নিমজ্জিত, আমাদের শক্তি ও সাধনাকে যে ব্রহ্ম-কৃপার বাহিরে ভাবিবার

জো নাই। আমাদের সর্বপ্রকার অহঙ্কার ও মমকার যে মিথ্যা, এ বিষয়ে কিছু বলিয়া উপসংহার করিতেছি।

সর্বময়ী কৃপা একটি পরম তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বুঝিতে অধিক দূরে যাইবার আবশ্যক নাই। জীবনকে সহজ বুদ্ধিতে পর্যালোচনা করিলেই এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি পক্ষীর জীবনের আদি-অন্ত আলোচনা করিতেছি। পক্ষীজীবনের আলোচনায় মানবজীবন সম্বন্ধে অনেক আলোক পাওয়া যাইতে পারে। পক্ষীটি সামান্য প্রাণী হইলেও তাহার জীবন পর্যালোচনায় যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা অবহেলার যোগ্য নহে।

বৃক্ষশাখায় ক্ষুদ্র কুলায়ে একটি পক্ষীডিম্ব অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সে আপনাকে আপনি জানে না। কোথা হইতে আসিল, কোথায় আছে, কে তাহাকে আনিল, কেন আনিল, এ সকল বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এ সকল ভাবিবার ক্ষমতাই তাহার নাই। সে আপনার অতীত ইতিহাসও জানে না, বর্তমান প্রয়োজনও জানে না, ভবিষ্যৎ নিয়তিও জানে না। তাহার জন্য যে এক আলোকময়, সৌন্দর্যময় ফলশস্যময় জগৎ এবং এক ক্ষুধাতৃষ্ণাময়, সুখদুঃখময়, কর্মবৈচিত্র্যময় জীবন অপেক্ষা করিতেছে, তাহা কল্পনা করিবার শক্তিটুকুও তাহার নাই। তাহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই; আপনাকে রক্ষা করিবার তিলমাত্র আয়োজন বা শক্তি নাই। কেহ হেলায় গড়াইয়া দিলে, মুহূর্তে তাহার অস্ফুট জীবনটুকু ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই জ্ঞানহীন, শক্তিহীন, উদ্দেশ্যহীন অবস্থায়ও সে বাস্তবিক অসহায় নয়।

ভাবিয়া দেখুন, ঊর্দ্ধে নীলাকাশ ব্যাপ্ত করিয়া জগজ্জননী তাহার প্রতি চাহিয়া আছেন ও তাহার বিষয়ে ভাবিতেছেন! সেই অসীম হৃদয়ে এই অচেতনবৎ, সম্বলবিহীন ডিম্বটির প্রতি স্নেহ বর্তমান। তিনি সেই স্নেহের গুণে পিতামাতারূপী দুইটি পক্ষীকে ডিম্বটির রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা আপন ক্ষুধাতৃষ্ণা, আনন্দউল্লাস ভুলিয়া পর্যায়ক্রমে দিনরাত্রি ডিম্বটিকে আদরে বক্ষে চাপিয়া উত্তাপ দিতেছে। কোনো শিকারী পক্ষী শত্রুরূপে নিকটে উপস্থিত হইলে সেই পিতা বা মাতা প্রাণভয়ে ভীত হইতেছে, আতঙ্কে তাহার নয়নযুগল চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, পলাইবার ইচ্ছাও মনে জাগিতেছে; কিন্তু ডিম্বটিকে ফেলিয়া যাইবার শক্তি তাহার নাই। বিশ্বমাতা অদৃশ্য স্নেহসূত্রে ডিম্বটির সহিত তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। পক্ষী হয়ত জানেও না (নূতন পিতামাতা হইলে ত নিশ্চয়ই জানে না) যে, এই ডিম্বটি হইতে শীঘ্রই একটি শাবক বাহির হইয়া তাহাকে আনন্দিত করিবে। কিন্তু বিশ্বজননী কেমন আশ্চর্য কৌশলে তাহার দ্বারা আপন কার্য করাইয়া লইতেছেন! আহা, ডিম্বটির রক্ষার জন্য কি আশ্চর্য ব্যবস্থা! ভাবী পক্ষীটির প্রতি কি আশ্চর্য করুণা!

পরে যথাসময়ে ডিম্ব হইতে শাবক বাহির হইল। সেই অন্ধ, খঞ্জ, নিঃসম্বল শাবকের উদরে ক্ষুধাবোধ জাগ্রত হইল। আহার কি বস্তু, কোথা হইতে আসিবে সে জানে না। তথাপি চঞ্চুপুট বিস্তার করিল। কাহার নিকট আহার চাহিল? এ জগতে কাহাকেও ত সে চিনে না; পিতামাতাকেও দেখে নাই, দেখিতেছে না; তথাপি চাহিল—অজ্ঞাত শূন্যের নিকটেই চাহিল! অমনি পিতামাতার চঞ্চুযোগে উপযুক্ত আহার তাহার মুখে পড়িল! সেই 'অজ্ঞাত, চিরন্তন শূন্যই' চাহিবার প্রেরণা দিলেন এবং তিনিই আহার যোগাইলেন!

ক্রমে পক্ষীশাবকের চোখ ফুটিল। দুইটি নয়ন উন্মীলন করিয়া সে সম্মুখে তাহার বিহারের ক্ষেত্র সুনীল গগনকে প্রসারিত দেখিতে পাইল। নবলব্ধ পদদ্বয় কিঞ্চিৎ শক্ত হওয়া-মাত্র সে কুলায় ছাড়িয়া বৃক্ষশাখায় বসিল এবং আপনার শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য ও আহ্লাদিত হইল। ক্রমে ডানাদুটি কর্মক্ষম হইতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নীলাকাশের আহ্বান-ধ্বনি হৃদয়ে শুনিতে লাগিল। অবশেষে একদিন মনের আনন্দে আকাশে উড্ডীন হইল।

তদবধি সে আপনার আহার্য আপনি সংগ্রহ করিতে লাগিল ও আপন পক্ষীজীবন পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ করিল। যতকাল বাঁচিয়া রহিল, সে জগজ্জননীরই প্রদত্ত ক্ষুধার তাড়নায় আহারের অন্বেষণ করিল; তাঁহারই প্রদত্ত আনন্দের আবেগে বৃক্ষশাখায় বসিয়া কাকলি করিল ও মুক্ত আকাশে উড়িয়া বেড়াইল; তাঁহারই প্রদত্ত দাম্পত্যপ্রীতিতে আবদ্ধ হইয়া কুলায় নির্মাণ করিল; তাঁহারই প্রদত্ত অপত্যস্নেহের বশবর্তী হইয়া সন্তান পালন করিল; এবং তাঁহারই প্রদত্ত জীবনতৃষ্ণার অধীন হইয়া কখনো বা দুর্বলের আহার হরণ, কখনো বা সবল হইতে পলায়ন করিল। অবশেষে সময় হইলে, জগন্মাতার ইচ্ছায় তাঁহারই নিয়মে পক্ষীটির জীবনলীলার অবসান হইল।

অব্যক্ত হইতে আসিয়া, কিছুকাল ব্যক্তরাজ্যে জীবনযাপন পূর্বক পুনরায় অব্যক্তে চলিয়া গেল!

মনোযোগ সহকারে এই পক্ষীজীবনের চিন্তা করিলে আমরা তিনটি তত্ত্ব লাভ করি। প্রথম, ডিম্বাকারে সংসারে আসিবার কালে তাহার স্ফুটভাবে কোনো চেতনাও ছিল না, কোনো সম্বলও ছিল না। যে সকল আন্তরিক বৃত্তি লইয়া, যে সকল শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে, ও যে সকল প্রাকৃতিক উপকরণের মধ্যে সে তাহার সমগ্র জীবন যাপন করিল, কিছুই তাহার নিজস্ব নহে। দ্বিতীয় তত্ত্ব ইহা হইতেই আসে। যাহা নিজস্ব নয়, অথচ সে দেখিল, শুনিল, পাইল, ভোগ করিল, তাহা নিশ্চয়ই কৃপার দান। পক্ষীটির কিছু পরিমাণে আত্মনিয়মন শক্তি বা 'স্বাধীনতা' ছিল বটে; কোন্ গাছে বাসা নির্মাণ করিবে, কোন্ অরণ্যে বিচরণ করিবে, কোন্ শস্যক্ষেত্র হইতে আহার সংগ্রহ করিবে, এ সকল বিষয় সে নিজেই বুঝিয়া স্থির করিত; কিন্তু সেই বুদ্ধি, সেই আত্মনিয়মন শক্তিও কৃপা হইতেই লব্ধ ছিল। তৃতীয় তত্ত্ব এই যে, এই অনন্ত কৃপা সম্পূর্ণ অহেতুকী। এই কৃপায় প্লাবিত জগতে পক্ষীটি নিজের কোনো যোগ্যতার বলে আগমন করে নাই এবং জীবিত-কালে যত করুণা ভোগ করিয়াছে তাহার এক কণাও স্বয়ং সৃজন করে নাই।

এ অবস্থায় পক্ষী যদি বলে—'আমি একজন করুণানিরপেক্ষ ব্যক্তি', সে যদি ভাবিতে থাকে—'আমারই এই শক্তি, আমারই কুলায়, আমারই শাবক, আমার পরিশ্রম, আমার উপার্জন,' তবে কেমন হয়? ইহাতে নিশ্চয়ই তার ঘোর অজ্ঞানতা প্রকাশ পায়। তার এই অহঙ্কার ও মমকার সম্ভব হয় এইজন্য যে, সে তার জীবনের আদি-অন্ত ভাবিতেছে না, সে আপনার ক্ষুদ্র জীবনকে বিস্তারিত দৃষ্টিতে অসীমের মধ্যে দেখিতেছে না। আপনাকে অসীমের মধ্যে দেখিলে, তার আর অহঙ্কার ও মমকার থাকিতে পারিত না।

পক্ষীজীবনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলাম এই জন্য যে, ইহার আদি-মধ্য-অন্ত আমরা চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া থাকি; ইহাকে সহজেই অসীমের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে পারি। নিজের সম্বন্ধে এইটি সহজে পারি না। আমরা সর্বদা জীবনের কেবল মধ্যভাগই দেখি। আদি-অন্ত দেখি না, সুতরাং ভাবিও না। যতদিন কেবল মধ্যভাগ দেখিব, ততদিন দৃষ্টি আংশিক থাকিবে। আংশিক দৃষ্টিতে অজ্ঞানতা দূর হয় না। অতএব জীবনের আদি-মধ্য-অন্তকে সর্বদা ব্রহ্মেতে, ব্রহ্মের অসীম শক্তি, জ্ঞান, প্রেম ও করুণার মধ্যে দেখিতে হইবে। সেই অসীম, অযাচিতা, অহেতুকী করুণা! তাহার মধ্যে আমরা আজীবন নিমগ্ন আছি; অনন্তকাল নিমগ্ন থাকিব। আমাদের সাধন-ভজন, কৃতিত্ব-পৌরুষ, সকলই কৃপাসাগরে নিমজ্জিত, কৃপার মধ্যে নিলুপ্ত!

'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্'

অতএব, 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' এই আমাদের জপমন্ত্র হউক। এই মন্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়; অহঙ্কার ও মমকার দূর হয়।

এই মহামন্ত্র পরিত্রাণ লাভের উপায়। আমি এ পর্যন্ত যাহা কিছু বলিলাম, প্রকৃতপক্ষে সকলই এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রের 'কেবলম্' কথাটির উপরে আমার বহুকাল দৃষ্টি পড়ে নাই। 'কেবলম্' কথাটিকে মনে মনে অত্যুক্তি ভাবিয়া অবহেলা করিয়াছি। মুখ উচ্চারণ করিয়াছি—'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্', কিন্তু মনে মনে ভাবিয়াছি—অর্দ্ধেক আত্মপ্রভাব, অর্দ্ধেক দেবপ্রসাদ। অথবা বড় জোর চৌদ্দ আনাই দেবপ্রসাদ; ন্যূনকল্পে দু' আনা আত্মপ্রভাব না থাকিলে চলিবে কিরূপে? সাধনার একটা স্থান থাকা ত চাই! যেন সাধনার স্থান কৃপার বাহিরে থাকাই আবশ্যক! যেন আমি ও আমার শক্তি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির বাহিরে! সাধনা পূর্ণ মাত্রায় থাকিবে, অথচ বলিব 'ব্রহ্ম কৃপাই কেবল', এই রহস্যময় তত্ত্ব বহুদিন অবোধ্য ছিল। ব্রহ্মার্পিত জীবনে যে সংসার ও ধর্মের, পরিশ্রম ও নির্ভরের, কর্ম ও জ্ঞানের, সাধনা ও কৃপার অতি সহজ ও সুন্দর সামঞ্জস্য আছে, বহুকাল তাহার সন্ধান মিলে নাই। আজও অধিকাংশ সময় কথায়-বার্তায়, কাজে-কর্মে পরম পিতার সহিত ভাগাভাগির ভাবই প্রকাশ পায়।

শুভ মুহূর্তে সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী কৃপার প্রকাশে আত্ম-শক্তির স্থান যেমন কৃপারই অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়, অন্য সময় সেই জ্ঞান থাকে না। তখন আবার মনে হয়, জীবনে কতক আমার, কতক তাঁহার। ব্রহ্মকৃপাই 'কেবল', জীবন এই মহাসত্যের সাক্ষ্য দিতেছে না। পক্ষী যখন ফল শস্য আহার করে, তখন যেমন কৃপাই আহার করে, যখন বায়ুহিল্লোলে

উড়িতে থাকে, তখন যেমন কৃপারই স্পর্শ পায়; যখন আহারার্থ পরিশ্রম করে ও সেই পরিশ্রমের মধ্য দিয়া জীবনকে অনুভব করে, তখন যেমন কৃপাকেই সম্ভোগ করে; আমরাও ত সেইরূপ সর্বক্ষণ সকল কার্যে সকল অনুভবে কৃপাকেই সম্ভোগ করিতেছি। অথচ সেই বোধ নাই। সেই বোধই ত ব্রহ্মোপলব্ধি; সেই বোধে সর্বদা থাকাই ত ব্রহ্মধামে বাস করা।

আপনারা আশীর্বাদ করুন, যেন 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' এই মহামন্ত্র জপিতে জপিতে ব্রহ্মধামে যাইতে পারি; যেন অহঙ্কারী স্বেচ্ছাচারী সন্তান পিতার গৃহে স্থান পায়।

ওঁ ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।

পরিশিষ্ট

এই প্রবন্ধের নানা স্থানে বলা হইয়াছে যে, আমাদের অন্তরের সকল শক্তি ও সকল বৃত্তিই ঈশ্বরের দান; আমাদের নিজস্ব কিছুই নাই। ইহা হইতে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে কি পাপ-প্রবৃত্তিসকলও ঈশ্বরেরই দান? তাহা হইলে, পাপপুণ্য সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব থাকে কিরূপে? আর, পুণ্যময় ঈশ্বর কি পাপ সৃষ্টি করিতে পারেন? পাপ সৃষ্টি করিয়া কেন তিনি মানবের দুঃখ বাড়াইলেন? এ সকল প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

মানুষের সকল কার্যের মূল তাহার জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা। ভাব ও ইচ্ছা অবশ্যই ঈশ্বরের দান। এই তিনটি শক্তি বা বৃত্তির বিকাশের তারতম্য অনুসারে আমাদের কার্যসকল ভাল বা মন্দ হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরমেশ্বর আমাদের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাকে প্রথমেই পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া দেন নাই। ইহাতে তাঁহার কোনো দোষ হয় নাই। সৃষ্ট জীব কখনো পূর্ণ হইতে পারে না। একমাত্র স্রষ্টাই পূর্ণ। মানুষ জ্ঞানে, ভাবে ও ইচ্ছায় অপূর্ণ বলিয়াই তাহার পাপের সম্ভাবনা রহিয়াছে। পরমেশ্বর মানুষেরই সহযোগিতায় তাহাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন। ইহাই তাঁহার মঙ্গল-ব্যবস্থা।

পাপপ্রবৃত্তি বলিয়া কোনো পৃথক বৃত্তি নাই। পাপ অভাবাত্মক। পরমেশ্বর যতগুলি বৃত্তি আমাদিগকে দিয়াছেন, সকলই ভাবাত্মক ও মঙ্গলকর। কিন্তু সেই ভাবাত্মক ও

মঙ্গলকর বৃত্তিসকলের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ আছে। যখন দুইটি বৃত্তির দুই প্রকার প্রেরণা আমাদের অন্তরে উপস্থিত হয়, তখন উচ্চতরকে অগ্রাহ্য করিয়া নিম্নতরের বশবর্তী হইলেই আমরা আত্মগ্লানি বা 'পাপ' অনুভব করি। আর, নিম্নতরকে অগ্রাহ্য করিয়া উচ্চতরের বশবর্তী হইতে পারিলে আত্মপ্রসাদ বা পুণ্য অনুভব করি। বৃত্তিসকলের উচ্চ-নীচ ভেদ বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের আছে, সে কথা পরে বলিতেছি।

পাপপুণ্যের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। জীবনতৃষ্ণা, সুখতৃষ্ণা, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি সকলই মঙ্গলকর বৃত্তি, এ সকল থাকাতেই মানুষ পরিশ্রম করে, গৃহনির্মাণ করে, অন্নবস্ত্র আহরণ করে, পরিবার প্রতিপালন করে। সাধারণতঃ এ সকল কার্যকে কেহই পাপ বলিয়া অনুভব করে না। কিন্তু যখন ইহার মধ্যে কোনো একটি বিশেষ কার্য ন্যায়বোধের বিরোধী হয়, তখনই তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হয়। ন্যায়বোধও একটি মঙ্গলকর বৃত্তি। আমার যেমন জীবনতৃষ্ণা, সুখতৃষ্ণা, ও স্বজনপ্রীতি আছে, অন্যেরও তদ্রূপ আছে; সুতরাং অন্যের অধিকারকে মান্য করিতে হইবে। এই বোধই ন্যায়বোধ। ইহা উচ্চতর বৃত্তি। যখন ইহাকে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ জীবনতৃষ্ণা বা স্বজনপ্রীতির প্রেরণায় কার্য করিতে যায়, তখনই তাহার কার্য মিথ্যা, প্রতারণা, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতির আকারে প্রকাশ পায়। উচ্চতর বৃত্তিকে অগ্রাহ্য করাতেই এ সকল পাপ বলিয়া অনুভূত হয়।

ন্যায়বোধ যে উচ্চতর বৃত্তি তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ বাহিরে নাই; অন্তরে। উচ্চতর বৃত্তির উচ্চতাবোধ আমাদের

প্রকৃতিতেই নিহিত আছে। স্বয়ং পরমেশ্বর আমাদের আত্মাকে এই বোধ দিয়াছেন। উচ্চতর বৃত্তির অনুযায়ী আমাদিগকে চলিতেই হইবে, এই বাধ্যতাবোধও তিনিই যোগাইতেছেন। ইহারই নাম ধর্মবুদ্ধি বা বিবেক। মানুষের সমুদয় নীতি ও ধর্ম ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্মবুদ্ধির ব্যবস্থার দ্বারাই পরমেশ্বর মানবাত্মাকে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় লইয়া যাইতেছেন।

যেমন শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনায়, অর্থাৎ কর্মে আমাদের শারীরিক জীবনের বোধ জন্মে, যেমন চিন্তাশক্তির চালনায় আমাদের মানসিক জীবনের বোধ জন্মে, তেমনি ধর্ম-বুদ্ধির চালনায় আমাদের নৈতিক বা আত্মিক জীবনের বোধ উৎপন্ন হয়। আত্মাকে ক্রমে উচ্চতর নৈতিক অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্যই পরমেশ্বর সর্বদা ধর্মবুদ্ধিতে প্রেরণা দিতেছেন।

পাপ স্বয়ং কোনো বস্তু নহে; উহা পুণ্যের অভাব। যেমন আলোকই বস্তু, অন্ধকার তাহার অভাব; ধনও বস্তু, দারিদ্র্য তাহার অভাব; সেইরূপ। সুতরাং পাপ কে সৃষ্টি করিল, এরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না। পাপ পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন নাই; তিনি আমাদের অন্তরে পাপ কার্যের প্রেরণাও দেন না। তিনি পুণ্যকার্যের প্রেরণা দেন, এবং আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিলে আমাদের অন্তরে আত্মগ্লানি জন্মান। তিনি পুণ্যময় এবং আত্মাতে অধিষ্ঠিত; এই কারণেই আত্মপ্রসাদ ও আত্মগ্লানি স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভব হয়।

আবার ইহাও প্রণিধান করা কর্তব্য যে, পাপ অভাব-

জ্ঞাপক বলিয়া উহা মিথ্যা বা কল্পনা নহে। অন্ধকার যেমন অভাবজ্ঞাপক হইয়াও সত্য, দারিদ্র্য যেমন অভাবজ্ঞাপক হইয়াও সত্য, পাপও তেমনি সাময়িক ভাবে সত্য। অন্ধকার জনিত ক্লেশ ও দারিদ্র্যজনিত ক্লেশের ন্যায় পাপজনিত ক্লেশও সত্য, অর্থাৎ কল্পনা নহে। অভাব হইলেও এ সকল সত্য অভাব। কিন্তু ভাব পদার্থ নয় বলিয়া এ সকলের সৃষ্টি নাই; সৃষ্টিকর্তাও নাই।

ওঁ ব্রহ্ম

পরিশিষ্ট

২

মানবাত্মা ও তার মহত্ত্ব

আত্মার মোহন জ্যোতি

কোনও সহরে বড় রাস্তার ধারে, একখানি জায়গায় একটি বাড়ী প্রস্তুত হবে। ভিত গাঁথবার জন্য মাটি খোঁড়া হচ্ছে। মজুরেরা খুব গভীর করে মাটি খুড়ছে। যে মাটি তুলেছে, তা এদিকে ওদিকে স্তূপাকার করে রেখেছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা সে সব স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে মাটি খোঁড়া দেখছে।

এমন সময় একজন মজুরের কোদালে কি একটা ঠং করে ঠেকল। সকলের দৃষ্টি সেদিকে গেল। ছেলেমেয়েরা অনেকে সে দিকে ঝুঁকল। আর দু'এক কোদাল মাটি তুললে দেখা গেল, —একটা পিতলের কলসীর মতন। চার দিকের মাটি আরও সরালে দেখা গেল—সত্যই কলসী! তখন জমির মালিকের কর্মচারী এগিয়ে এসে লোকজন সরিয়ে দিলেন। মজুরদের ঠেলে দিয়ে বল্লেন, "তোরা সরে যা, আমি দেখছি"। তিনি নিজ হাতে মাটি সরিয়ে কলসীটা টেনে বার করলেন। বহু কালের পুরোণো জিনিস; মাটির তলায় এতকাল থেকে থেকে এমন হয়েছে যে, পিতলের রঙ আর নেই। সে কালের পুরু কলসী বলে এখনও টিকে আছে। বড় ভারী। ঢাকনাটি একটু সরিয়ে দেখলেন, গোল গোল মুদ্রায় পূর্ণ; কিন্তু সেকালের পয়সা, কি টাকা, কি অন্য কিছু বুঝবার যো নেই।

অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক নিবেদিত উপদেশ। পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ —১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২

যাহোক, একজন বিশ্বস্ত চাকরকে কাছে ডেকে, তার সাহায্যে কলসীটা টেনে উপরে তুললেন। তারপর চাদর দিয়ে জড়িয়ে, দু'জনে বয়ে কর্তার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

কলসী যখন গিয়ে কাছারী ঘরে পৌঁছাল, তখন কর্তা সে ঘরেই ছিলেন। কর্মচারীরা বাজে লোক সব বার করে দিয়ে কর্তার সামনে ঢাকনা খুললেন। এক মুঠা মুদ্রা তুলে, সকলে এক একটা হাতে নিয়ে, বেশ করে ঘষে ঘষে দেখতে লাগলেন। কিন্তু প্রত্যেকটি মুদ্রার গায়ে এত ময়লা জমেছে, এবং সে ময়লা এমন শক্ত হয়ে লেগে আছে যে, এ যে আর ছাড়ান যাবে এমন মনে হচ্ছে না। যেন মুদ্রার ধাতু আর ময়লা এক হয়ে গিয়েছে, যেন ধাতুই ময়লা, ময়লাই ধাতু। এ মুদ্রা যে কোনোও কাজে লাগান যাবে, এমন আশা হচ্চে না। কর্মচারীদের ও চাকরবাকরদের মন দমে গেল। কর্তা নির্বিকারে চুপ করে রইলেন।

যাহোক, কলসী যখন পাওয়া গেছে, তখন এটাকে ত আর ধা করে জলে ফেলে দেওয়া যায় না! চাকরেরা নিয়ে কলসীটা ভাঁড়ার ঘরে তালা দিয়ে রাখল। দু'দিন যায়, চারদিন যায়, চাকরেরা দু'টো চারটে মুদ্রা নিয়ে, যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই দেখায়। কিন্তু কেউ আর ঘষে মেজে কিছু করতে পারে না। দস্তা কি তামা, তাই ঠিক করা গেল না।

অবশেষে সকলে যখন নিরাশ ছিল, তখন একদিন কর্তা বল্লেন, "এগুলি গরিবদের বিলিয়ে দাও। কেউ যদি কিছু

বার করতে পারে, করুক।" একজন কর্মচারী বল্লেন, "হুজুর! যদি শেষে রূপাই বেরোয়?" কর্তা বল্লেন, "হয়, ভালই; গরিবেরা পাবে। আমার ত কিছু অভাব নেই! যে নিতে চায়, তাকেই একটা করে দাও।" তখন বিলানো আরম্ভ হল। কৌতূহলের বশে বহুলোক এসে একটি একটি নিয়ে গেল। দুদিনের মধ্যে বিতরণ শেষ হয়ে গেল।

অনেকে মুদ্রা নিয়ে গিয়ে টিপেটুপে শেষে ছেলেপিলেদের দিয়ে দিল। ছেলেপিলেরা চাকৃতিগুলো নিয়ে খেলা করে। খেলা শেষ হলে, যেখানে সেখানে ফেলে রাখে; কোনও আদর নেই। এ জিনিষ আর কি কাজে লাগবে?

এইরূপ দিন যায়; একটি লোক আর নিরাশ হয় না। সে চাকতিটাকে পরিষ্কার করবেই। প্রতিদিন অবসরমত ওটাকে নিয়ে ঘষামাজা করে, নানা উপায় অবলম্বন করে। অবশেষে বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলে, একদিন চাক্‌তির এক কোণের ময়লা একটু সরে গেল। তখন দেখে কি, ঐ জায়গাটুকু চক্ চক্ করচে! দেখে তার আশা বেড়ে গেল। সে আরও ঘষতে লাগল। ক্রমে বেশ খানিকটা জায়গা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তখন স্পষ্টই বুঝতে পারা গেল, এ দস্তাও নয়, তামাও নয়। এমন কি রূপাও নয়; সোনা! তখন ঐ অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি চতুর্গুণ উৎসাহে মুদ্রাটির সর্বাঙ্গ পরিষ্কার করতে লাগল। যখন সবটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তখন পাড়া পড়শী সকলে দেখে অবাক! যাঁরা হেলায় নিজের মুদ্রা হারিয়ে ফেলেছেন, তারা তখন হায় হায় করতে লাগলেন। যাঁদের মুদ্রা তখনও ছিল, তাঁরা ঘরে গিয়ে

সেটি খুঁজে বার করলেন ; এবং ঐ ব্যক্তির উপদেশমত তাকে পরিষ্কার করার কাজে নিযুক্ত হলেন।

মুদ্রার এই দৃষ্টান্তটি মানবাত্মা সম্বন্ধে বেশ খাটে। প্রত্যেক মানুষের আত্মা যেন এইরূপ এক একটি মুদ্রা।

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্ত।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ॥

শ্বেতা, ২।১৪

সংসারের মোহে মলিন হয়ে রয়েছে। এমন মলিন যে, এ যে কোন কাজে লাগবে মনে হয় না। অসত্যে, অপ্রেমে, ভোগাসক্তিতে, ক্ষুদ্র চিন্তায়, আমরা এমন আবৃত আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি যে, এই যে আমাদেরই মধ্যে যে উজ্জ্বল আত্মা বর্তমান আছে, তা কল্পনা করাই আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে গিয়েছে। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে নিরাশ, পরের সম্বন্ধেও নিরাশ। নিজেকেও শ্রদ্ধা করি না, অপরকেও শ্রদ্ধা করি না। নিজেকে, অপরকে, সকলকেই বাজার-হাটের মানুষ, হীন পৃথিবীর মলিন জীব বলে মনে করি। নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টি করি, দেখি কত মিথ্যা, কত হিংসা-দ্বেষ, কত পাপ! অপরের জীবনের প্রতি দৃষ্টি করি ; চারদিকে দেখি কেবলই মিথ্যাচার, কেবলই বঞ্চনা, কেবলই নিষ্ঠুরতা, কেবলই পাপাসক্তি। এ পৃথিবী যেন নরক, এখানে যেন কোন অজ্ঞাত পাপের ফলে, অভিশপ্ত হয়ে আমরা এসেছি ; কোনওরূপে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম করে, আপনাকে বাঁচিয়ে,

খেয়ে পরে জীবনকালটা কাটিয়ে যেতে পারলেই যেন হয়। এর বেশী কোনও নিয়তি যেন আমাদের জন্য নেই। সংসারে এই ভাবেই আমরা জীবন কাটাচ্ছি ; এবং চারদিকে এই ভাবই দেখতে পাচ্চি। লাখ, লাখ, কোটি কোটি মানুষ আপনার ও পরস্পরের যথার্থ মর্যাদা না জেনেই জীবন কাটিয়ে যাচ্চে।

কিন্তু এর মধ্যেও দেখা যায়, কোনও কোনও লোক, জীবনকে এমন নিরাশার চক্ষে দেখে তৃপ্ত হতে পারেন নি। তাঁরা, ঐ যে ব্যক্তি মলিন মুদ্রাটি নিয়ে ঘষামাজা আরম্ভ করেছিল, তার মত আপনাকে নিয়ে ঘষামাজা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, যে যা বলুক, অবশ্য এই জীবনের কিছু অর্থ আছে। যদি এই জীবনের মালিক কেউ থাকেন, আর যদি তিনি জ্ঞানময়, মঙ্গলময় হন, তবে এ জীবন কখনও অর্থহীন হতে পারে না। কেবল খাওয়া পরা, আর কিছুকাল বেঁচে থাকার জন্য এ জীবন হয় নি। এই ভেবে তাঁরা আপনাকে শুদ্ধ করবার চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন। চেষ্টা করে করে যখন তাঁরা দেখলেন, আপনারই মধ্যে কোন কোন অংশে জ্যোতি ফুটে উঠল, তখন তাঁরা চমকে গেলেন। একি! এ যে আশ্চর্য জ্যোতি! এর বর্ণ ত বাইরের আবরণের ন্যায় নয়! বাইরের আবরণ যে দেহ, তার বর্ণ পৃথিবীর বর্ণেরই মত। কিন্তু এর বর্ণ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন! এ যে স্বর্গীয় জ্যোতি!

পূর্বে দেহের প্রতি দৃষ্টি রেখে রেখে মনে হচ্ছিল, "সুখসাধনই জীবনের লক্ষ্য—সত্যই বা কি, মিথ্যাই বা কি? স্বার্থান্বেষণই জীবনের মূলমন্ত্র—ন্যায়ই বা কি অন্যায়ই বা কি?

আপনাকে বাঁচানই চতুরতা—প্রেমই বা কি, অপ্রেমই বা কি? প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই পথ—পুণ্যই বা কি, পাপই বা কি?” দেহ ত এই কথাই বলে; এর অতিরিক্ত অন্য কথা বলবার তার সাধ্য কি? দেহ তার নিজের বিচারেই বিচার করবে।

কিন্তু এই যে নূতন জ্যোতি, সে যে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলচে! এই জ্যোতি দেখাচ্চে, “সত্যই জীবনের লক্ষ্য—সুখ-সাধন হউক বা না হউক। ন্যায়ই জীবনের মূল-মন্ত্র—স্বার্থ বজায় থাক আর না থাক। প্রেমই চতুরতা, আপনাকে বাঁচান যাক আর না যাক। পুণ্যই পথ, প্রবৃত্তি চরিতার্থ হউক আর না হউক।” এ ত জড় পৃথিবীর কথা নয়! জড় পৃথিবী যাকে লাভজনক বলে প্রমাণ করে দিচ্ছে, এই জ্যোতি ত তাকে মানচে না! এই স্বর্গীয় জ্যোতির, এই আত্মজ্যোতির যে পৃথক স্বভাব। তার স্বভাবই যে সত্য, তার স্বভাবই যে ন্যায়, তার স্বভাবই যে পুণ্য। অনেক ক'রে আপনাকে উলট্ পালট্ করে, পরীক্ষা ক'রে তাঁরা দেখলেন, আত্মার স্বভাব দেহের স্বভাব হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যাঁরা আপনার মধ্যে আপনার এই শুদ্ধ স্বরূপ একবার দেখতে পেলেন, তাঁরা আগেকার মোহাচ্ছন্ন মলিন জীবন নিয়ে আর তৃপ্ত থাকতে পারলেন না। তাঁদের অন্তরে সংগ্রাম আরম্ভ হ'ল। আত্মজ্যোতি উজ্জ্বল হওয়াতে তার আলোকে আগেকার দেহাসক্ত জীবনকে ঘোর কুৎসিত দেখাতে লাগল। আপনাকে ঘষে মেজে আরও পরিষ্কার করতে তাঁদের যত্ন দশগুণ বেড়ে গেল। এইরূপে যতই শুদ্ধ হতে লাগলেন,

উজ্জ্বল হতে লাগলেন, ততই তাঁদের আশা বাড়তে লাগল, বল বাড়তে লাগল।

জগতে ধর্ম নিয়ে যাঁরা পাগল হয়েছিলেন, তাঁরা এই আত্ম-জ্যোতি দেখেই পাগল হয়েছিলেন। তাঁরা কি চর্মচক্ষে কিছু দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন? তাঁরা যে আকুল হয়ে সকলকে ডেকেছিলেন, তাকি বাইরের কোনও সৌন্দর্য দেখবার জন্য? বাইরে ত কত সৌন্দর্য জগতে চিরদিনই রয়েছে। তা দেখে মানুষ মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু কেউ ত পাগল হয় না।

মহাত্মা যীশু যে 'স্বর্গরাজ্য', 'স্বর্গরাজ্য' করে ক্ষেপেছিলেন, সে কি বাইরের কোনো বস্তু দেখে? তিনি ত নিজেই বলেছিলেন—'স্বর্গরাজ্য অন্তরে'। নিকোডিমাস্ নামক একজন পদস্থ লোক যিশুর সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করলে যিশু বলেছিলেন—“আপনারা মনে করেন, ধর্মরাজ্য সকল মানুষের জন্য কোনও নির্দিষ্ট স্থানে বা কোনও নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহা নহে। স্বর্গরাজ্যের আগমন এই ভাবে বুঝিতে হইবে:—এই সমগ্র পৃথিবীতে সর্বদাই কতকগুলি লোক পরমাত্মা হইতে জাত আত্মাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন ও ধর্মরাজ্যের প্রজা হন। যাহারা সেই আত্মাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মানুষের মধ্যে যে আত্মা আছে, তাহার যিনি কারণ, তিনি শুধু তাঁহাদেরই পিতা, যাঁহারা তাঁহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করেন। অতএব, তাঁহার নিকট কেবল তাঁহারাই জীবনবান, যাঁহারা তাঁহার প্রদত্ত সেই আত্মার জীবনকে রক্ষা করেন।” (মহাত্মা যিশুর পুণ্যকাহিনী, ৩১ পৃঃ)

পরমাত্মা হইতে জাত আত্মাতে বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ কি? পরমাত্মা যেমন সত্যস্বরূপ, ন্যায়স্বরূপ, পুণ্যস্বরূপ, জীবাত্মাও যে তেমনি, তাই দেখা; অর্থাৎ আপনার মধ্যে শুদ্ধ আত্মার জ্যোতি দর্শন করা। আর আত্মার জীবনকে রক্ষা করার অর্থ কি? আত্মার এই যে শুদ্ধ স্বভাব, তার অনুযায়ী জীবন যাপন করা। যারা পরমাত্মা হ'তে জাত আত্মাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং আত্মার জীবনকে রক্ষা করেন, তাঁরাই ধর্মরাজ্য বা স্বর্গরাজ্যের প্রজা হন। এই স্বর্গরাজ্যেরই সুসমাচার সকলকে দিবার জন্য মহাত্মা যিশু জুডিয়ার গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ক্ষিপ্তের ন্যায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

আত্মজ্যোতির কি সৌন্দর্য যিশু দেখেছিলেন, যার জন্য তিনি যে কেবল নিজে সর্বত্যাগী হয়েছিলেন তা নয়, সকল মানুষকেই সর্বত্যাগী হতে ডেকেছিলেন! তিনি স্বর্গরাজ্যের বর্ণনা নানা ভাবে করেছিলেন। তার মধ্যে একটি বর্ণনা এই: স্বর্গরাজ্য বহুমূল্য মুক্তার ন্যায়—'a pearl of great price.' এ বিষয়ে তিনি যা বলেছিলেন, তার ভাবটি এই;—মনে কর, এক ব্যক্তি একটি বহুমূল্য মুক্তা বিক্রী করতে নিয়ে এসেছে এবং যাকে পায় তাকেই দেখাচ্ছে। লোকে মুক্তাটি হাতে নিয়ে দেখছে, আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে। কেউ ভাবছে, এর আবার এত দাম হবে কেন? কেউ ভাবছে, মুক্তাটি যথার্থ মূল্যবান বটে; কিন্তু একটা মুক্তার জন্য এত টাকা খরচ করা নিবুর্দ্ধিতা। অবশেষে একজন লোক মুক্তাটি দেখে, তার উজ্জ্বলতায়, তার সৌন্দর্যে এমন মুগ্ধ হল যে, তার মনে হল, এ

না কিনলে আর চলছে না; যেমন করেই হোক কিনতেই হবে। এই ভেবে সে বাড়ী চলে গেল। বাড়ী গিয়ে তার যা কিছু সম্পত্তি ছিল, সব বিক্রী করে দাম সংগ্রহ করে, মুক্তাওয়ালার কাছে এনে হাজির করল। সর্বস্ব দিয়েও মুক্তাটি পেয়ে সে নিজেকে লাভবান মনে করতে লাগল।

যিশু বল্লেন, স্বর্গরাজ্য এইরূপ; তুমি যদি সর্বস্ব দিয়েও তা পাও, নিজেকে ভাগ্যবান মনে কোরো। এ কি সৌন্দর্য যিশু আত্মার মধ্যে দেখেছিলেন? আত্মার এ কি অসীম মূল্য তিনি অনুভব করেছিলেন? আত্মার সেই সৌন্দর্য, সেই শুদ্ধ স্বভাব যদি রক্ষা না পেল, তবে তাঁর মতে জীবন ধারণের কোনও অর্থই রইল না। আত্মার শুদ্ধ স্বভাবকে রক্ষা করাই তাঁর মতে যথার্থ জীবন; আর সেই স্বভাব নষ্ট করাই মৃত্যু। তিনি বলেছিলেন—"দেখ, যদি কেহ জগতের সমস্ত পদার্থ লাভ করে, কিন্তু আপন জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট করে, তবে তাহার সকল পাইয়াই বা লাভ কি?" (মহাত্মা যিশুর পুণ্যকাহিনী, ৭৯ পৃষ্ঠা)

মহানারী মৈত্রেয়ীও ত স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে এই কথাই বলেছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন প্রব্রজ্যা অবলম্বন করবার সময়, আপনি সম্পত্তি দুই পত্নীর মধ্যে ভাগ করে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ভগবন্! যদি এই সমস্ত পৃথিবী বিত্তের দ্বারা পূর্ণ হয়, তদ্দ্বারা কি আমি অমৃতা হতে পারব?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করলেন—"ভোগের উপকরণশালী ব্যক্তিদিগের জীবন যেমন, তোমার জীবনও

সেইরূপই হবে। বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নেই।” এই কথা শুনে মৈত্রেয়ী এই চিরস্মরণীয় বাণী উচ্চারণ করলেন—“যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্?” যার দ্বারা আমি অমৃতা হব না, তা নিয়ে আমি কি করব?

অমৃতা হওয়ার অর্থ কি! আপনাকে অমর আত্মা বলে জানা—বাইরের যত কিছু মলিন আবরণ তা আমি নই, যা কিছু পাপ-দুর্মতি, তা আমার নিত্যস্বভাব নয়, এইটি অনুভব করা; ব্রহ্ম যেমন নিত্য-মুক্ত শুদ্ধ স্বভাব, আমিও তেমনি, এই জেনে সর্ব কার্যে সেই স্বভাবকে রক্ষা করা। এরই নাম অমৃতত্ব লাভ। যিশুর ‘সত্যজীবন লাভ’ বা ‘স্বর্গ-রাজ্যে’ প্রবেশ, আর মৈত্রেয়ীর ‘অমৃতত্ব লাভ’ কি দুই ভিন্ন বস্তু? দুই একই বস্তু; কেবল ভাষার প্রভেদ। উভয়েরই মতে এই বস্তুর মূল্য এত অধিক যে, এর জন্য পৃথিবীর সকল সম্পদ ছাড়বার প্রয়োজন হলে, তাই করা শ্রেয়ঃ। যিশু যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করাকে এবং মৈত্রেয়ী যে অমৃতত্ব লাভকে এত বড় জিনিষ মনে করলেন, তার কারণ কি? তাঁরা আপনার মধ্যে স্বর্গরাজ্য দেখেছিলেন, অমৃতত্বের আস্বাদন পেয়েছিলেন। আত্মজ্যোতির দর্শনেই তাঁরা পাগল হয়ে উঠেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য যে ‘কৃষ্ণ রে, বাপ রে’, বলে কেঁদে আকুল হতেন, তা কি কোনো বাইরের জিনিসের জন্য? তাঁর কৃষ্ণ কি অপর দশজনের ‘কৃষ্ণ’র মত বাইরের বস্তু ছিলেন? পরে গয়ার পথে কি হোল, যাতে পাগল হয়ে গেলেন! গূঢ় কথা এই যে যেমন করে হউক, তাঁর আত্মার আবরণ একটু সরে গিয়েছিল; আর

তিনি আপনার মধ্যে অসীম প্রেমের উৎস দেখতে পেয়েছিলেন। এতেই তাঁর আগেকার মত জীবন-যাপন ঘুচে গেল। কি যে মোহন জ্যোতি দেখলেন, সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অবশিষ্ট জীবন তিনি ক্ষিপ্তের মতন কাটালেন। আত্মাতে প্রতিফলিত সেই অসীম প্রেমের মোহন জ্যোতিকেই তিনি নাম দিয়েছিলেন—‘কৃষ্ণ’। যখনই প্রাণে সেই জ্যোতির অনুভব ম্লান হত, প্রাণে শুষ্কতা আসত, তখনই “কৃষ্ণ রে, বাপ রে, কোথা গেলি রে” বলে চীৎকার করে কাঁদতেন। সেই অনির্বচনীয়কে কে বর্ণনা করতে পারে? সেই অসীমকে কেই বা নাম দিয়ে অপরের কাছে বোঝাতে পারে? কিন্তু আপন আত্মার জ্যোতিতে সেই পরম জ্যোতিকে দেখলে সকলকেই পাগল হতে হয়।

জগতে যত সাধুভক্ত যথার্থ কিছু পেয়েছিলেন, ঐ আত্ম-জ্যোতির মধ্য দিয়েই পেয়েছিলেন। মানবাত্মাই সেই দ্বার, যার মধ্য দিয়ে পরমাত্মার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য মানুষ জানতে পারে; যার মধ্য দিয়ে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য মানুষের জীবনে আসে।

এক একজন সাধুভক্ত আত্মজ্যোতির এক এক দিক দেখেছিলেন। তাতেই তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন, আত্মহারা হয়েছিলেন। চিরজীবন তাঁদের ঐ ধ্যান, ঐ জ্ঞান হয়েছিল। এই মানবাত্মা, যাকে আমরা এত অবহেলা করি, এর মধ্যে যে কত কি আছে তার কিনারা কে করতে পারে? অনন্ত অফুরন্ত সেই ভাণ্ডার; অনন্ত অফুরন্ত সেই সৌন্দর্য।

আত্মার এই জ্যোতি আমরা দেখেছি কিনা, তার পরিচয় কি? জীবনেই তার পরিচয়। আমাদের শিথিল দেহনিষ্ঠ

জীবনই প্রমাণ করচে যে, আমরা দেখি নাই ; অন্ততঃ এমন পরিমাণে দেখি নাই যাতে আকুল হওয়া যায়, মুগ্ধ হওয়া যায়, আত্মহারা হওয়া যায় ; যাতে সংসারের লাভ ক্ষতি গণনা ভোলা যায় ; যাতে মান অপমান সমান হয়।

যদি না দেখে থাকি তবে প্রশ্ন এই, কি উপায়ে সেই আত্মদর্শন হতে পারে ? কি সেই ঘষা মাজা, যার দ্বারা আত্মার বহুকালের মলিন আবরণ ক্ষয় হয়ে, তার আসল স্বরূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ বলবেন—নিত্যানিত্য বিচার ; কেহ বলবেন—শাস্ত্রালোচনা ; কেহ বলবেন—ধ্যান ; কেহ বা অন্য কিছু নির্দেশ করবেন। এই সকলগুলিই শ্রেষ্ঠ এবং অত্যাবশ্যকীয় উপায় সন্দেহ নাই। কিন্তু আরেকটি উপায় আছে, যার অভাবে অন্য সব উপায়ই নিষ্ফল হয়ে যায়। সেটি হচ্চে—যে জ্ঞানালোকটুকু আপাততঃ আমার মধ্যে আছে, তাকে কার্যগত জীবনে প্রয়োগ করা, দৈনন্দিন আচরণে তাকে প্রতিফলিত করা। আমাদের সকল জ্ঞানালোচনা, সকল ভক্তি-চর্চা, সকল সাধন-ভজন ব্যর্থ হয় এই জন্য যে, যে আলোকটুকু আছে, তাকে জীবনের কার্যে খাটাবার জন্য যথোচিত ব্যগ্রতা আমাদের নেই ; কার্যকালে সেই আলোক-টুকুকে অস্বীকার করি।

মনে করুন, আমি এই সাধন নিয়েছি যে, প্রতিদিন সহস্রবার জপ করব—'সত্যং শিবং সুন্দরং'। নিষ্ঠার সহিত এইটি করে যাচ্চি। কিন্তু যখন সময় এল জীবনের কার্যে সত্যকে, মঙ্গলকে, সুন্দরকে মান্য করবার, তখন উদাসীন্যবশতঃই হউক, বা স্বার্থহানির ভয়েই হউক, বা প্রবৃত্তির প্রলোভনেই হউক, হেরে গেলাম ; জেনে শুনে, ইচ্ছাপূর্বক, অসত্যকে অমঙ্গলকে অসুন্দরকে জীবনে স্থান দিলাম। এতে কি দাঁড়াল ? সত্য শিব সুন্দরকে যে এই একবার অস্বীকার করা হ'ল, তাতে কি আগেকার সহস্র জপ নিষ্ফল হয়ে গেল না ? একবারের অস্বীকারে কি সহস্র সহস্রবার স্বীকার ব্যর্থ হয়ে গেল না ? যেমন, কোন ব্যক্তি যদি তার বন্ধুকে দশ দিন আদর দেখিয়ে বলে—"ভাই তোমাকে আমি বড় ভালবাসি, তোমার কোনো বিপদ হলে আমি তোমায় অর্থ দিয়ে সাহায্য করব" ; কিন্তু যখন সত্য সত্য বন্ধুর বিপদ উপস্থিত হয়, তখন যদি নানা ওজর আপত্তি দেখায়, তাহলে কি আগেকার সকল মিষ্টবাক্য বাতিল হয়ে যায় না ? কার্যকালে যা দাঁড়ায়, তাই সত্য, অপর সব মিথ্যা। আমাদের জ্ঞানচর্চা, সাধনভজন অনেক সময় এইরূপে মিথ্যা হয়ে যাচ্চে।

অতএব, "Live up to thy Light"—তোমার অন্তরস্থ আলোককে ধ'রে তার অনুযায়ী জীবন যাপন কর—এর মত মূল্যবান কথা আর নেই। আলোককে কার্যে খাটালেই তা উজ্জ্বল হতে থাকে। কার্যে খাটাতে গেলে কত সংগ্রাম আসে, পরীক্ষা আসে, সমস্যা দেখা দেয়, প্রার্থনা জাগে। এ সকলের মধ্য দিয়েই নূতন নূতন আলোক আসে, আর সমস্যাসমূহের মীমাংসা হয়। কার্যগত জীবনের সংগ্রামেই বিশ্বাস নির্ভরের অনুশীলন হয় ; আত্মার বল বাড়ে। এই পথ দিয়েই ধর্মের

রাজ্যে যথার্থ প্রবেশ লাভ হয়। যাঁরা কেবল বুদ্ধি দিয়ে ধর্মের গূঢ় তত্ত্বসকল বুঝতে চান, জ্ঞানকে কার্যগত জীবনে প্রয়োগ করার পথ দিয়ে যান না, তাঁদের বোঝা ঠিক হয় না। কাজ ক'রে ক'রে যে বোঝা, সেই বোঝাই যথার্থ বোঝা। মহাত্মা যিশু বলেছিলেন, "আমার প্রদত্ত শিক্ষার তাৎপর্য বুঝতে হলে, সদনুষ্ঠানের প্রয়োজন।" বস্তুতঃ সদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সত্য আলোক পাওয়া সম্ভব। সদনুষ্ঠানকে ত্যাগ করে অন্য পথে নয়।

যে আলোকটুকু আছে, কার্যগত জীবনে তার অনুযায়ী হয়ে চলাই যে উজ্জ্বলতর, বিশুদ্ধতর আলোক পাবার উপায়, মহাত্মা গান্ধীও তাই বলেছেন। ১৯৩১ সালে ইংলণ্ডে থাকা কালে আমেরিকার কোনও গ্রামোফোন কোম্পানী মহাত্মাকে ধরেছিল, একটি বক্তৃতা করতে; তারা তা record করে পৃথিবীর সর্বত্র বিক্রী করবে। তিনি বল্লেন, "রাজনৈতিক ব্যাপারসকল অস্থায়ী। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবর্তন হয়। অতএব আমি রাজনৈতিক বিষয় না বলে, ধর্ম বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করব। যা সকল দেশে, সকল কালে কাজে লাগতে পারে।" এই বলে তিনি ধর্মবিষয়ে একটি বক্তৃতা করলেন।

এই বক্তৃতায় তাঁর ধর্মমতের সার মর্ম চিরকালের জন্য নিবদ্ধ হয়ে আছে। বক্তৃতাটি প্রত্যেক ধর্মার্থীর পাঠ করা উচিত। ২৭শে অক্টোবরের (১৯৩১) অমৃতবাজার পত্রিকায় তা বেরিয়েছিল; ১লা ও ৮ই নভেম্বরের Indian

Messenger-এও তার অধিকাংশ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। এই বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধী বলেছেন,— ঈশ্বর যে আছেন এবং তাঁর ধর্মনিয়ম যে আছে, এটা তর্কের পথে বোঝা কঠিন। সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা হচ্ছে, ধর্ম-নিয়মে অর্থাৎ সত্যের নিয়মে ও প্রেমের নিয়মে—বিশ্বাস স্থাপন করা। যে ব্যক্তি দৃঢ় সংকল্প করেছে যে, যা কিছু সত্য ও প্রেমের বিরোধী, তাকে অবিলম্বে বর্জন করবে, তারই বিশ্বাসের প্রকৃত অনুশীলন হবে।

এই কথার মধ্যে আমরা কি পাই! পাই এই যে, সত্য ও প্রেম, যা আত্মার স্বরূপ, তাকে সন্দেহ করা উচিত নয়। তার অনুগত হয়ে চলাই তাকে উজ্জ্বলতর করে অনুভব করবার উপায়।

মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র জীবনের সাধনাই ত এই,—জীবনে সত্যের প্রয়োগ। তিনি নিজের জীবন-কাহিনীকে নাম দিয়েছেন— "My experiments with Truth"—অর্থাৎ সত্যকে নিয়ে তিনি জীবনে যে পরীক্ষা করেছেন তার কাহিনী। এখানে 'সত্য' বলতে সত্য, ন্যায়, প্রেম, পুণ্য সবই—আত্মার বিশুদ্ধ স্বরূপ। সেই স্বরূপ বস্তুতঃ অখণ্ড; যদিও আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য তাকে ভাগ ভাগ করে দেখি।

মহাত্মা গান্ধীও তরুণ বয়সে অপর দশটি বালকের মতই ছিলেন। চুরীও করেছিলেন, মিথ্যা কথাও বলেছিলেন, কুপ্রবৃত্তির অধীনও ছিলেন। কোন্ পথ ধরে তিনি আজ জগৎ-পূজ্য হলেন? সেই পথটি এই,—আত্মাতে একটি একটি করে আলোক রেখা দেখা দিয়েছে, আর অমনি তাকে জীবনে

প্রতিফলিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। যিশুর ভাষায় 'পরমাত্মা হইতে জাত আত্মাতে বিশ্বাস স্থাপন' করেছেন; এবং সেই 'আত্মার জীবনকে রক্ষা' করেছেন। বিশ্বাস তাঁর প্রবল ছিল এবং সত্যকে জীবনে প্রতিফলিত করবার আগ্রহ ও অধিক ছিল; তাই এক জীবনে এত উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

আমাদের সকলেরই জন্য এই পথ খোলা রয়েছে। আত্মা কারো মধ্যে বড়, কারো মধ্যে ছোট নয়, কারো মধ্যে সবল, কারো মধ্যে দুর্বল নয়। ছোট-বড়, সবল-দুর্বল, এ সব প্রভেদ বাইরের আবরণের রাজ্যে। প্রত্যেকের মধ্যে যে কি অসীম সত্য, অসীম প্রেম, কি উজ্জ্বল শুদ্ধতা, অপরাজেয় শক্তি, কি অভয়, কি আনন্দ রয়েছে, তা কি আমরা এখন জানি? জানি না। কিন্তু জগতের সকল সাধু-মহাজন এক বাক্যে যে আশ্বাস দিচ্ছেন, তাতে আস্থা স্থাপন ক'রে নিজেকে শুদ্ধ করবার কাজে লাগতে হবে। যতই শুদ্ধ করব, ততই সত্যের প্রকাশ হবে; সংশয় যাবে, দুর্বলতা যাবে।

আপনাকে শুদ্ধ না ক'রে, গ্রন্থাদি হতে যে বিদ্যা পাই, তা পরা বিদ্যা নয়—সাক্ষ্য জ্ঞান নয়। পরা বিদ্যা ঋগ্বেদেও নাই, বাইবেলেও নাই, উপনিষদেও নাই; আছে কেবল বিশুদ্ধ আত্মার মধ্যে। শাস্ত্রসকল আত্মার ঘর্ষন-মার্জনের উপায়মাত্র। নির্মল হৃদয়েই অনির্বচনীয় পরমেশ্বর বিরাজিত।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদোবিদুঃ ॥
মুণ্ডক, ২.২।৯

আত্মারূপ জ্যোতির্ময় পরমকোষ মধ্যে নির্মল অখণ্ড ব্রহ্ম। তিনি শুভ্র, জ্যোতির জ্যোতি; সেই তিনি যাঁকে আত্মবিদের জানেন।

পরিশিষ্ট

৩

ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ

ব্রাহ্মধর্ম ও স্বাভাবিক ধর্ম

শতাধিক বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য আচার্য ও বক্তা কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়ে আসছে ; তবুও এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছে বলা যায় না। এ বিষয়ে আমি যে প্রণালীতে চিন্তা করি তা এখানে উপস্থিত করছি।

ব্রাহ্মধর্মের প্রথম স্বরূপ-লক্ষণ এই যে, ইহা স্বাভাবিক ধর্ম। 'স্বাভাবিক ধর্ম' বলতে এই বুঝি যে, যেমন পদার্থ বিজ্ঞানের নানা বিভাগে মানুষ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, চিন্তা, গবেষণা প্রভৃতির সাহায্যে চিরদিন নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে ও করছে, ধর্মের তত্ত্বও তেমনিভাবে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, চিন্তা, ধ্যান প্রভৃতির সাহায্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে ও হচ্ছে ; কোনও অলৌকিক উপায়ে স্বর্গ নামক কোনও পৃথক স্থান হতে আসে নি। ধর্ম সম্বন্ধে এরূপ যাঁদের মত, তাঁরাই ইহার স্বাভাবিকতায় বিশ্বাসী ; তাঁরাই ব্রাহ্মধর্মের সন্ধান পেয়েছেন।

বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম সম্মিলনীর ১৯৪১ সালে মালিয়াট অধিবেশনে শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক আলোচনা উত্থাপন কালে কথিত— ১৯৪১ সালের ২রা নভেম্বর তত্ত্বকৌমুদীতে মুদ্রিত [৬৪ ভাগ ; ১৪শ সংখ্যা ; ১৬ই কার্তিক ১৩৪৮ রবিবার]

পৃথিবীর নানা দেশে এরূপ বিশ্বাস খুবই প্রচলিত আছে যে, জগতের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর কোন এক উর্দ্ধলোকে বাস করেন। তাঁর তত্ত্ব ও তাঁর ইচ্ছা জানবে এমন শক্তি পৃথিবীস্থ মানুষের নেই। এই কারণে ঈশ্বর কোনও অলৌকিক উপায়ে তা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং মানবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে আপনার বক্তব্য বলে গিয়েছেন; অথবা তিনি আপন একমাত্র পুত্রকে বা প্রধান ভৃত্যকে বা শিক্ষাপ্রাপ্ত অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সে লোক হতে এ লোকে প্রেরণ ক'রে তাঁর দ্বারা আপনার তত্ত্ব প্রচার করেছেন।

এরূপ যাঁদের মনের ভাব, স্পষ্টই দেখা যাচ্চে, তাঁরা ধর্মের স্বাভাবিকতায় বিশ্বাস করেন না। তাঁরা আপনাদের অবলম্বিত পৃথক পৃথক ধর্মের ভিত্তি কারো না কারো উক্তির উপরে স্থাপন করেছেন—হয় অবতীর্ণ ঈশ্বরের, না হয় ঈশ্বরের পুত্রের, না হয় ভৃত্যের, না হয় তাঁর প্রেরিত কোনও মহাপুরুষের। তাঁরা আপনাদের ধর্মের মতামতের সত্যতা ও ধর্মার্থে অনুষ্ঠিত বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার আবশ্যকতা প্রমাণ করতে হলে প্রাচীন গ্রন্থবিশেষ উদ্‌ঘাটন করেন। স্বাভাবিক ধর্মের অনুসরণকারীরা এরূপ স্থলে কাগজে লিখিত কোনও গ্রন্থ উদ্‌ঘাটন করেন না; তাঁরা ঐশ্বরিক মূল গ্রন্থ যে দুই প্রকৃতি রাজ্য—বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি—তাই উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখান এবং যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বসকল উক্ত দুই প্রকৃতি রাজ্যে এবং যুক্তির অনুসরণেই পাওয়া যায়।

দুই প্রকৃতি রাজ্যের পর্যবেক্ষণের দ্বারাই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব

এবং তাঁর শক্তি, জ্ঞান, মঙ্গলভাব, পবিত্রতা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং মানুষের সম্বন্ধে তাঁর ইচ্ছাও জানা যায়। তিনি সুদূরে, কোনো অজ্ঞাত স্বর্গলোকে রয়েছেন, এমন নয়।

সমগ্র শস্য ক্ষেত্রে তিনি বর্তমান। এখানেই তাঁর শক্তি, জ্ঞান ও মঙ্গলভাব দেখতে পাওয়া যাচ্চে। মাটি চাষ করে ধান্য বপন করা হয়েছে। তার উপরে বৃষ্টি পড়েছে, সূর্যের আলোক ও উত্তাপ লেগেছে, বায়ুর হিল্লোল তাকে আপনার স্পর্শ দিয়েছে, পৃথিবী রস যুগিয়েছে। এ সকলের ফলে কিছুদিনের মধ্যে সেই ধান্য বীজগুলি হতে অসংখ্য গাছ জন্মেছে। শীঘ্রই এর প্রত্যেকটি গাছে ষাটটি, আশীটি বা একশটি ক'রে ধান ফলবে। একটি ধান হতে কি করে একশটি ধান হয়? এই ক্ষুদ্র, কিন্তু পরম আশ্চর্য ব্যাপারটির মধ্যে কি পরমেশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, ও মঙ্গলভাব উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় না? মাটি জল বায়ু সূর্যালোক, সকলেরই মধ্যে বিশ্বপতি পরমেশ্বর বর্তমান থেকে কার্য করছেন।

এইরূপে চিন্তা করলে দেখা যায় জগৎ তাঁর আবির্ভাবে পূর্ণ। যেমন বাহিরের প্রকৃতিতে, তেমনি ভিতরের প্রকৃতিতে অর্থাৎ আত্মাতেও তাঁর পরিচয় সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যায়। অন্যের কথায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করবার দরকার হয় না। এইরূপে সাক্ষাৎভাবে তত্ত্ব লাভের যে ধর্ম, তা-ই স্বাভাবিক ধর্ম। ব্রাহ্মধর্ম এই অর্থে-ই স্বাভাবিক।

বিশ্বজনীন ধর্ম

দ্বিতীয় কথা এই যে, ব্রাহ্মধর্ম যখন প্রকৃতি রাজ্যে পাওয়া যায়, তখন ইহা সকলেরই নিকট উপস্থিত। উপযুক্ত যত্ন চেষ্টা দ্বারা আপনার জ্ঞানকে মার্জিত করলে, প্রীতিবৃত্তিকে বিকশিত করলে, হৃদয়কে নির্মল করলে, চরিত্রকে উন্নত করলে সকলেই এ ধর্ম স্বয়ং জানতে পারে, পেতে পারে,—এ বিষয়ে দেশের ভেদ নেই। এজন্য ব্রাহ্মধর্মের দ্বিতীয় লক্ষণ—ইহা বিশ্বজনীন ধর্ম। অর্থাৎ সকল দেশের ও সকল কালের মানুষের ধর্ম।

যাঁরা গোড়াতেই একজন মানুষকে ঈশ্বরের অবতার ব'লে, একমাত্র পুত্র ব'লে, সর্বপ্রধান ভৃত্য ব'লে বা বিশেষভাবে প্রেরিত মহাপুরুষ ব'লে বিশ্বাস করতে বলেন, অথবা যাঁরা আপনাদের মনোনীত একখানা গ্রন্থকে ধর্মতত্ত্বের একমাত্র খনি বলে গ্রহণ করতে উপদেশ দেন, তাঁদের ধর্মকে কখনও বিশ্বজনীন বলা যেতে পারে না। তাঁরা গোড়াকার ঐ সব বিশেষ বিশেষ মতবাদের জন্যই সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছেন।

একটি সহজ প্রশ্নের দ্বারা আমরা নিজ নিজ মনকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি যে, আমরা সাম্প্রদায়িক ধর্মে বিশ্বাসী, কি বিশ্বজনীন ধর্মে বিশ্বাসী। আমরা যদি মনকে প্রশ্ন করি—ধর্ম অগ্রে, কি মহাপুরুষগণ ও শাস্ত্রসকল অগ্রে?—আর মন যদি বলে, 'মহাপুরুষগণ ও শাস্ত্রসকল অগ্রে'—অর্থাৎ তাদের থেকেই ধর্ম উৎপন্ন হয়েছে, তা হলে বুঝব, আমরা সাম্প্রদায়িক ধর্ম নিয়ে নিয়ে আছি। পক্ষান্তরে মন যদি বলে, ধর্ম অগ্রে, অর্থাৎ

ধর্মকে ন্যূনাধিক আবিষ্কার করা ও জীবনে পালন করার ফলেই মহাপুরুষগণ মহাপুরুষরূপে মান্য হয়েছেন এবং ধর্মের তত্ত্ব কথঞ্চিৎ লিখিত থাকার ফলেই শাস্ত্রসকল শাস্ত্ররূপে আদরনীয় হয়েছে,—তা হলে বুঝব, আমরা স্বাভাবিক ও বিশ্বজনীন ধর্মে বিশ্বাসী হয়েছি।

বহু বৎসর পূর্বে একটি চার বছর বয়সের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—বল দেখি খোকা বাতাস কি করে হয়? সে কিঞ্চিৎ ভেবে উত্তর করল—'গাছের পাতা নড়ে বলে'। তার এই উত্তরের মূলে অবশ্য যুক্তি ছিল। সে পূর্বে দেখেছে পাখা নড়লে গায়ে বাতাস লাগে; সুতরাং তাই থেকে সিদ্ধান্ত করল—যখন পাখা নাড়া হচ্ছে না, অথচ বাতাস এসে লাগচে ওদিকে গাছের পাতাও নড়চে, তখন অবশ্য গাছের পাতা নড়ার ফলেই বাতাস উৎপন্ন হচ্চে। কিন্তু যখন আবার তাকে প্রশ্ন করা হল গাছের পাতা নড়ে কেন? তখন শিশু নিরুত্তর।

তেমনি, জগতের কোটি কোটি মানুষ যেন ঐ শিশুটির মত বলচেন—অমুক মহাপুরুষ বা অমুক শাস্ত্র নড়াতেই পৃথিবীতে ধর্ম প্রচলিত হয়েছে। তাঁহাদের যদি প্রশ্ন করা যায়—'উক্ত মহাপুরুষ বা শাস্ত্র নড়লেন কোন্ শক্তির প্রভাবে'? তা হলে তাঁদের নিশ্চয়ই নিরুত্তর হতে হয়।

বাস্তবিক যে কোনো মহাপুরুষ বা যে কোনো শাস্ত্র সম্বন্ধে চিন্তা করলে এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, জগতে তার পূর্বেও ধর্ম ছিল। সত্যধর্ম চিরদিনই বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে বর্তমান ছিল। মহাপুরুষগণ ও শাস্ত্রসকল তারই

৬

কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করে সমসাময়িক লোকদের সম্মুখে পরিবেশন করেছেন। এই গ্রহণ ও পরিবেশনের সময় ধর্মের যথার্থ তত্ত্বের সঙ্গে যে তৎকালীন জনসমাজের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার, লেখকদের ভ্রান্তি ও কল্পনা কতক পরিমাণে মিশ্রিত হবে, এটা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু দেশে দেশে যুগে যুগে যত ধর্মান্দোলনের স্ফুরণ হয়েছে, সবই সেই চিরন্তন সত্যধর্মের অদৃশ্য প্রভাবে। আবার তারই প্রভাবে পৃথিবীতে মানুষের অজ্ঞানতা-মিশ্রিত ধর্মমত ও সাধন প্রণালী সকল ক্রমে সুসংস্কৃত ও সমুন্নত হয়ে উঠচে। অতএব, সেই চিরন্তন সত্যধর্মই যে সর্বমানবের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হওয়া উচিত, তাতে কি আর সন্দেহ আছে? যাঁরা কোনো একজন মহাপুরুষে বা কোনো একখানি শাস্ত্রগ্রন্থে আবদ্ধ না থেকে সেই সত্যধর্মের অন্বেষণ করেন, তাঁরাই বিশ্বজনীন ধর্মের সাধক।

উদারতার ধর্ম

ব্রাহ্মধর্মের তৃতীয় লক্ষণ উদারতা। বিশ্বজনীন ধর্মের সাধক অনুদার হতে পারেন না। সত্যই যখন তাঁর লক্ষ্য, পরমেশ্বরের প্রবর্তিত ধর্ম-নিয়ম সকলই যখন তাঁর অনুসরণীয়, ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রীতিই যখন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, তখন এ সকল বিষয়ে সহায়তা গ্রহণ করতে তিনি দেশের ভেদ বা সম্প্রদায়ের ভেদ মনে আনবেন কেন? তিনি সকল দেশের ও সকল সম্প্রদায়ের সাধুসাধ্বীগণকে অপক্ষপাতে ভক্তি করেন; সকল দেশের ও

সকল সম্প্রদায়ের প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মগ্রন্থসকল তিনি শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করেন এবং তা হতে সত্য ও কল্যাণকর অংশসমূহ গ্রহণ ক'রে তদ্দ্বারা আপন জীবনকে পরিপুষ্ট করেন। ধর্মবন্ধুতা স্থাপনেও তিনি সম্প্রদায়ের ভেদ করেন না। অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গুণসকলকে তিনি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন ও নিজ জীবনে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেন। নিজের ও নিজ সম্প্রদায়ের দোষসকলকে তিনি বিনীত ভাবে স্বীকার করেন ও সংশোধনের চেষ্টা করেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপদেশাদি পাঠ ও গ্রহণ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে তা কি ক'রে সম্ভব? সকল সম্প্রদায়ের উপাসনা-প্রণালী, ধর্মকর্মের রীতি ও সামাজিক প্রথাও একরূপ নয়; সুতরাং এ সব বিষয়ে তাঁদের উপদেশও ভিন্ন ভিন্ন। হিন্দু বলেন, পূর্ব বা উত্তরাভিমুখে পদ্মাসনে বসে পূজা আহ্নিক কর; মুসলমান বলেন, পশ্চিমদিকে মুখ করে এক-একবার দাঁড়িয়ে, এক-একবার ব'সে ও ভুমিতলে মস্তক স্থাপন ক'রে নমাজ কর; খ্রীষ্টান বলেন, জানুপরি অবস্থান ক'রে নির্দিষ্ট প্রণালীতে প্রার্থনা কর। অন্যান্য ধর্মকর্ম বিষয়েও এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ উপদেশ রয়েছে। সামাজিক প্রথাও বিভিন্ন প্রকার। এ অবস্থায় সকলগুলি পালন ক'রে চলা কি একই ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, এগুলি ধর্মের বাহিরের অঙ্গ। ধর্মের সার অংশ হচ্চে আত্মসংযম, সত্যনিষ্ঠা, চিত্তশুদ্ধি, চরিত্রগঠন, মানবপ্রীতি, জনসেবা, ঈশ্বরের স্বরূপ জানা,

তাঁর প্রতি ভক্তি, নির্ভর, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি। বাহিরঙ্গ মানব-রচিত; যে দেশের লোক যেমন ভাল বুঝেছেন, সেরূপ উপাসনা প্রণালী ও রীতিনীতি প্রবর্তন করেছেন। সেগুলির মধ্যে বিচারপূর্বক একটিই গ্রহণ করতে হবে; সবগুলি গ্রহণ করা বাস্তবিকই অসম্ভব। কিন্তু দেখতে হবে, যেটি গ্রহণ করচি, সেটি অসত্য, অযৌক্তিক, অনিষ্টকর বা বিশ্বজনীন ধর্মের বিরোধী না হয়। ধর্মের সার অংশ ঈশ্বর প্রবর্তিত; তার সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়েরই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের উপদেশ প্রায় একরূপ। সে সকল উপদেশ, উদার ও অসাম্প্রদায়িক মন নিয়ে, শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করলে ও জীবনে পালন করলে প্রভূত কল্যাণ হয়। বিশ্বজনীন ধর্মের সাধকদের ইহাই রীতি।

মিলন সাধনের ধর্ম

এই উদারতা হতে ব্রাহ্মধর্মের আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তা এই যে, এ ধর্ম পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন সাধনের অনুকূল। ইহা চতুর্থ লক্ষণ। অনুদারতা দুরত্ব ঘটায়, বিচ্ছেদ আনয়ন করে। যদি বলা যায়—আমার সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সত্যধর্মকে অলৌকিক উপায়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রবর্তকেরা তা পারেন নি; আমার সম্প্রদায়ের অমুক ধর্মগ্রন্থখানা ঈশ্বর-প্রদত্ত, সুতরাং অভ্রান্ত, অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থগুলি মানুষের লিখিত,

সুতরাং ভ্রান্তিপূর্ণ; আমার সম্প্রদায়ের সাধুভক্তেরাই উন্নত স্তরের সাধুভক্ত, অন্যান্য সম্প্রদায়ে তেমন জন্মান নি; আমার সম্প্রদায়ের উপাসনা-প্রণালী ও রীতিনীতিই সর্বোৎকৃষ্ট, তা অবলম্বন না করলে কেহই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হতে পারবে না; —তবে আর মিলনের আশা থাকে না।

বর্তমানে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ধর্ম নিয়ে যত বিরোধ দেখা যায়, তা এইরূপ মনোভাবেরই ফল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন যদি কখনও সম্ভব হয়, তবে এ সব গোঁড়ামি পরিত্যাগ ক'রে ধর্মের বিশ্বজনীন ভাব গ্রহণের দ্বারাই সম্ভব হবে। আজকাল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামার বৃদ্ধি দেখে সকল চিন্তাশীল লোকের মনই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। তাঁরা এর প্রতিকারের জন্য নানা উপায়ের কথাই বলছেন। কিন্তু একটি কথা জেনে রাখা উচিত—যে পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায় কুসংস্কার ও গোঁড়ামি পরিত্যাগ ক'রে বিশ্বজনীন ধর্মের দিকে অগ্রসর না হবেন, সে পর্যন্ত স্থায়ী মিলন কিছুতেই হবে না।

বিজ্ঞান ও দর্শন এ ধর্মের চির-সহায়

ব্রাহ্মধর্মের পঞ্চম লক্ষণ এই যে, বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে ইহার বিরোধ নাই। কেবল বিরোধ নেই তা নয়; ব্রাহ্মধর্ম স্বাভাবিক ধর্ম বলে বিজ্ঞান ও দর্শন ইহার চির সহায়। ভাবী যুগে বিজ্ঞান ও দর্শনের নূতন নূতন আবিষ্কার ব্রাহ্মধর্মকে

ক্ষতিগ্রস্ত করা দূরে থাক, বরং ইহাকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপন করবে। কোনও বিশেষ মহাপুরুষের বা বিশেষ শাস্ত্র-গ্রন্থের উক্তিতে ধর্মমত ও ধর্মের ক্রিয়াসকলকে আবদ্ধ রাখলে বিজ্ঞান দর্শনকে ভয়ের চক্ষে দেখবার কারণ ঘটে—কি জানি কোন নব আবিষ্কার আমাদের কোন চিরপোষিত মত বা চির আচরিত ক্রিয়াকে কুসংস্কার বলে প্রতিপন্ন ক'রে দেয়!

কিন্তু যাঁরা সত্যকেই ধর্মের ভিত্তি মনে করেন, তাঁরা নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বকে ভয় করবেন কেন! তাঁরা প্রয়োজন হ'লে নিঃসঙ্কোচে আপনাদের পূর্ব সংস্কার-সকলকে সংশোধন ক'রে নেবেন। তাঁরা আপনাদের কুসংস্কার-সকলকে কখনও ছল চাতুরীর দ্বারা বিজ্ঞান দর্শন সম্মত ব'লে প্রতিপন্ন করবার জন্য ব্যগ্র হবেন না। 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' নামে যে এক প্রকার ব্যাখ্যা প্রাচীনতা মাত্রেরই পক্ষপাতী ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়, তার মূলে প্রকৃত সত্যান্বেষণ নেই, তার মূলে কেবল সাম্প্রদায়িক রক্ষণশীলতা। সত্যান্বেষীর একমাত্র লক্ষ্য সত্যকে আবিষ্কার করা ও অনুসরণ করা। কোনো মহাপুরুষ, কোনো শাস্ত্র বা কোনো চিরাগত প্রথাকে রক্ষা করা তাঁর লক্ষ্যের বহির্ভূত।

ইহা চির-বিকাশশীল ধর্ম

এই ভাব হইতেই ব্রাহ্মধর্মের ষষ্ঠ লক্ষণ পাওয়া যায়, তা এই যে, এ ধর্ম চির-বিকাশশীল (ever progressive)। মানব

ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতেই ব্রাহ্মধর্ম পৃথিবীতে ছিল এবং তখন হইতেই মানুষের ধর্ম-জ্ঞানের সংশোধন ও বিকাশ হয়ে এসেছে। 'প্রারম্ভ হইতেই ব্রাহ্মধর্ম ছিল' কারণ, সত্যই ধর্ম এবং সত্যই ব্রাহ্মধর্ম। আদি কাল হতেই মানুষ অল্পে অল্পে সত্য আবিষ্কার করে আসছে এবং আদি কাল হতেই সভ্য মানুষের ভ্রান্তি ও কল্পনা হতে অল্পে অল্পে মুক্ত হচ্চে। এরই নাম মানব-জ্ঞানে ধর্মের ক্রমবিকাশ। প্রসারিত দৃষ্টিতে মানবসমাজের ইতিহাসের দিকে তাকালে এই ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকে না। পৃথিবীর ধর্মের ক্রমবিকাশের ধারার যে অংশকে আমরা বিশেষ ভাবে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে অভিহিত করি (অর্থাৎ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় দ্বারা আরব্ধ অংশ), তার মধ্যেও সংশোধন ও বিকাশ সর্বদাই চলে আসচে। মহাপুরুষ, শাস্ত্রে বা প্রথাতে ব্রাহ্মরা আবদ্ধ হয়ে না পড়লে এই বিকাশ ভবিষ্যতেও অবাধে চলতে থাকবে।

সামঞ্জস্যের ধর্ম

ব্রাহ্মধর্ম সামঞ্জস্যের ধর্ম। কি কি বিষয়ে সামঞ্জস্য?—(১) শারীরিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনের সহিত ঈশ্বরভক্তি-সাধনার সামঞ্জস্য; (২) জ্ঞানসাধন, ভক্তিসাধন, ও কর্ম-সাধনের মধ্যে সামঞ্জস্য; (৩) ধর্মের প্রাচ্যভাব যে আত্মজ্ঞান, ধ্যানসাধন, কেবল আপনার মুক্তি অন্বেষণ প্রভৃতি,—তার সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবের অর্থাৎ কর্তব্যনিষ্ঠা, নীতিপরায়ণতা,

লোকহিতৈষণা, ধর্মপ্রচার প্রভৃতির সামঞ্জস্য। ব্রাহ্মধর্মের স্বাভাবিকতা ও বিশ্বজনীনতা হতেই এ সকল বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে সামঞ্জস্য সহজ ভাবে আসে।

ব্রাহ্মসমাজ কি ?

এই যে সাতটি লক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মধর্মের কথা বলা হ'ল, তারই সাধন ও প্রচারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ নামক সঙ্ঘটি স্বাভাবিক ভাবে গঠিত হয়েছে। জনসমাজের সেবা সাধনেরই অঙ্গ, কারণ, তার দ্বারা সেবকের জীবনের বিকাশ হয়। প্রচারও প্রকৃতপক্ষে সেবা, এবং সাধনের অঙ্গ ; কারণ, সাধক পরমেশ্বরের আদেশ পালনের জন্যই প্রচার করেন। অতএব 'সাধন' কথাটির মধ্যে জনসেবাও আছে ধর্মপ্রচারও আছে। এই অর্থে ব্রাহ্মসমাজ একটি সাধক সঙ্ঘ—একটি ব্রতী-সঙ্ঘ। সাধনের জন্য বা ব্রত পালনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ না হলে চলে না। এরূপ সঙ্ঘ গঠন করলে সাম্প্রদায়িকতা হয় না। ব্রাহ্মসমাজ বিশ্বজনীন ধর্মের সাধকদের সঙ্ঘ। আমরা যেন এই ভাবে ব্রাহ্মধর্মকে ও ব্রাহ্ম-সমাজকে দেখি।